ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

সেপ্টেম্বর ২০১৬ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ২২

নারীর ক্ষমতায়ন

ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন
কমলা ভাসিন

মহিলাদের ক্ষমতায়ন : সক্রিয় সরকার
লীনা নায়ার

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
ইলা আর ভাট

কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি
মেরি ই জন

ফোকাস
সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা
দেবকী জৈন

৭০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
বিশেষ নিবন্ধ
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েরা
ড. জ্যোতি অটওয়াল
স্বাধীনতার যোদ্ধা সেইসব অগ্নিকন্যা

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ—নারীদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে :

- সরকার জোরকদমে নারীদের ক্ষমতায়ন, নারীদের স্বাস্থ্য, এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ে নারীদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও তাদের বাস্তব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।
- "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও"-এর মতো সরকারি প্রচেষ্টা সফল করতে সমাজের সহযোগিতার জন্য ডাক দেন।
- জোর দেওয়া হয় যে সাড়ে তিন কোটির বেশি পরিবার মুদ্রা যোজনার সুবিধা পেয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই এই প্রথমবার ব্যাংকে যান। তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই মহিলা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে এদের অবদান নিয়ে তিনি আশাবাদী।
- বিকাশের গাথায় অংশীদার, নতুন মায়েরা যাতে তাদের নবজাতকের লালন-পালনের সুযোগ পান, সে জন্য ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করেন।
- তাঁত ও বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত মানুষ, যারা সুতা ও সুতার রোল বানান, তারা এখন থেকে ১০০ টাকার বদলে পাবেন ১৯০ টাকা; সুতা শিল্পে যুক্ত মহিলারা এতে উপকৃত হবেন।
- রেশম শিল্পে নিযুক্ত তাঁতিরা উৎপাদনের জন্য মিটার পিছু ৫০ টাকা করে বেশি পাবেন। ব্যবসায়ী বা ফোড়ে নয়, এই বাড়তি টাকা যাতে উৎপাদনকারীর কাছেই পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করতে, আধার-এর সাহায্যে এই টাকা সরাসরি তাঁতির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। এতে তাঁতিদের—যাদের মধ্যে অনেক মহিলাও আছেন—ক্ষমতায়ন হবে।
- কোটি কোটি পরিবার "সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা" দ্বারা উপকৃত হয়েছে। মেয়েরা বেড়ে উঠলে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করে এই যোজনা।
- "ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণ যোজনা" মহিলাদের জন্য দু'টি জিনিস সুনিশ্চিত করেছে—আর্থিক ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য জনিত সমস্যার বিরুদ্ধে ক্ষমতায়ন।
- দরিদ্র পরিবারগুলিকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, যার উদ্দেশ্য উনুনের ধোঁয়া থেকে মুক্তি দেওয়া, তার মাধ্যমে অনেক দরিদ্র মহিলার ক্ষমতায়ন হয়েছে। তিন বছরের মধ্যে ৫ কোটি দরিদ্র পরিবারকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত একশো দিনে প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলাকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন — কমলা ভাসিন ৫
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন : সক্রিয় সরকার — লীনা নায়ার ৯
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন — ইলা আর ভাট ১৩
- কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি — মেরি ই জন ১৬
- নারীর ক্ষমতায়ন : সমকালীন তথ্যের আলোকে পর্যবেক্ষণ — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য ২০
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন : বহু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি — ড. সুভাষ শর্মা ২৬
- ভারতে স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য : কতটা এগিয়েছি, কতটা এগোতে হবে — শৈলেন্দ্র শর্মা ও ড. শশীরঞ্জন ঝা ৩২

বিশেষ নিবন্ধ

- দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েরা — ড. জ্যোতি অটওয়াল ৪০
- ঋণ-নীতির সেকাল-একাল — অনিন্দ্য ভুক্ত ৪৪
- ডেঙ্গু মোকাবিলায় জরুরি দু'-চার কথা — ডা. ডি মাঝি ও ডা. ডি রায় ৪৮

ফোকাস

- সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা — দেবকী জৈন ৫০

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? (স্বাধীনতার যোদ্ধা সেইসব অগ্নিকন্যা) — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৫৪
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫৬
- যোজনা ডায়েরি —ওই— ৫৭

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

"নারীদের ক্ষমতায়নই উন্নয়নের সব থেকে বেশি কার্যকরী হাতিয়ার..."—অন্য কোনও বাক্য নারীদের সক্ষমতাকে এর থেকে ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। নারীরা অর্জন করতে পারেনি এমন বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই—তা সে পরম্পরাগত ভূমিকায় হোক বা আধুনিক রূপে। মাতৃরূপে তারা অনাদিকাল থেকে দুনিয়ার ভাবী নাগরিকদের গর্ভে ধারণ করে, জন্ম দিয়ে, লালন-পালন করে আসছেন। কন্যা, সহদরা ও স্ত্রীর ভূমিকায় তারা পুরুষকে নানাভাবে সমর্থন জুগিয়েছেন। আরও আধুনিক রূপে তাদের শিক্ষাবিদ, ব্যবস্থাপক, রাজনৈতিক নেত্রী, প্রভৃতির ভূমিকায় দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে, লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে তারা বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাজের ভাগীদার হতে এগিয়ে এসেছে। পর্বতারোহী, বিমানচালক, এমন কী সশস্ত্র বাহিনীতে যুদ্ধংদেহী রূপেও তাদের দেখা যায়।

অবশ্য, শুরু থেকেই পরিস্থিতি এমন অনুকূল ছিল না। প্রাচীনকালে পুরুষের পরিচয় ছাড়া কোনও নারীর অস্তিত্বকে গণ্যই করা হতো না—সে শুধু কন্যা, স্ত্রী বা মা। সে নেতৃত্বদান করতে পারত না—তার অস্তিত্বকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করতে তার জীবনের 'পুরুষরা', পিতা-পতি-পুত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বা সুযোগ ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজেও এই ধ্যানধারণা বিদ্যমান ছিল, সেখানেও অনেক পরে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতে, প্রায় এক শতকের সংগ্রামের ফলে মহিলারা সম্পত্তির অধিকার, ভোটাধিকার, বিবাহ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আইনের চোখে সমানাধিকার অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণেতারা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ সমাজে নারীদের পুরুষের সমকক্ষ বলে স্বীকৃতি দেন। আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমমর্যাদা দিতে বিভিন্ন সময়ে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিগত কয়েক দশকে সংসদে নানা আইন পাস করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের বিকাশের লক্ষ্যে অনেক কিছু করা হয়েছে।

যোজনা

শিক্ষা বহুলাংশে নারীদের সক্ষম করে তুলেছে এবং যেখানে মহিলারা শিক্ষিত, সেখানে ক্ষমতায়ন হয়েছে সবচেয়ে দ্রুত। বিবাহ, মাতৃত্ব ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে শিক্ষা। বিয়ে ছাড়াও অন্যান্য সুযোগের সন্ধান দিয়েছে শিক্ষা; দিয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা; তা সে বাবা হোক বা স্বামী, কমিয়েছে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা। বাড়িতে হিংসা বা মানসিক নির্যাতন আর তার মুখ বুজে সহ্য করার প্রয়োজন নেই। গর্ভধারণ ও অবাঞ্ছিত গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে শিক্ষা।

স্বাস্থ্য আরও একটি ক্ষেত্র যেখানে মহিলারা সমস্যার সম্মুখীন। বেশিরভাগ মহিলারই স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবহার করার সময়, সুযোগ বা মানসিকতা নেই। বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে মহিলারা বাড়িতে শৌচালয়ের মতো মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকাঠামো পান না। তাই, নারীদের স্বাস্থ্যকে সরকারি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই মর্মেই 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' ও 'জননী-শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম'-এর মতো প্রকল্পের সূচনা করা হয়।

ভারতীয় সমাজে মহিলাদের নিচু স্থানের অন্যতম কারণ বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্না বা অবিবাহিত মহিলাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের সব সময় সামাজিকভাবে নিম্ন অবস্থানের হকদার হিসাবে ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বিদ্রুপের শিকার হন। অবশ্য, ধীরে হলেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের নারী সেই প্রাচীন যুগকে পিছনে ফেলে প্রকৃত অর্থেই অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে সে বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল পেরোতে সফল হয়েছে। আজকের দিনে প্রভাবশালী মানুষদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলার নামও রয়েছে—অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, ইন্দ্রা নুয়ি, কিরণ মজুমদার শ' ও চন্দা কোছার এর উজ্জ্বল উদাহরণ। সম্প্রতি ভাবনা কান্ত, অবনী চতুর্বেদী ও মোহনা সিং ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হন এবং ২০১৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার স্থল-সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর নারীবাহিনী রাজপথে প্যারেড করে। এটাই নারীশক্তির সাফল্য। "নারীর উন্নয়ন"-এর থেকে আরও এগিয়ে "নারীর নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন"-এর দিশায় পা বাড়ানোর যে স্বপ্ন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন, তাকে স্বার্থক করেছে এই সব মহিলারা।

বিশ্ব জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মহিলা। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের মতো সমানাধিকার তাদের প্রাপ্য। আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে "নারীর ক্ষমতায়ন"-এর অন্তর্ভুক্তি এই সত্যকেই প্রমাণিত করে। শুধুমাত্র পরিবারই নয়, দেশ ও দুনিয়ার নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতার গুরুত্ব পরিস্ফুট হয় স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্যে : "পাখি যেমন এক ডানায় ভর করে উড়তে পারে না, তেমনই নারী জাতির অবস্থার উন্নতি না হলে জগতের উন্নতি সম্ভব নয়"।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন

*জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে মহিলা ও কন্যাসন্তান। এরা শুধুমাত্র ভারতে কেন, অধিকাংশ দেশেই বৈষম্যের বলি। মেয়েদের উপর চলে জোরজুলুম-হিংসা। রাষ্ট্রসংঘের কথায়, প্রতি তিন মহিলার মধ্যে একজনকে পড়তে হয় হিংসার মুখে। এর অধিকাংশই ঘটে পরিবারের চৌহদ্দিতে। নিবন্ধের বক্তব্য, নিজেদের মধ্যে হরেক ফারাক থাকায় এ দেশে মেয়েদের সম্পর্কে কোনও সাধারণ ধারণায় আসা কঠিন। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ভারতে বেশিরভাগ মেয়ে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও ধ্যানধারণার শিকার। এখানে বহু জায়গায় ভয়ভীতি, দমন-পীড়ন, বাধাবিঘ্ন সাথী করে জীবন কাটাতে হয় তাদের। মহিলাদের জন্য কিছু সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে। তাদের আরও বেশি ক্ষমতা দেবার পক্ষে জোর সওয়াল আছে এই নিবন্ধে। এই ক্ষমতায়ন এক নিরন্তর ও গতিশীল প্রক্রিয়া। মহিলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পুরুষের পক্ষেও ভালো তথা পরিবার ও জাতির জন্য শুভ। লিখেছেন—*****কমলা ভাসিন**

আজকাল অধিকাংশ দেশ মনে করে পরিবার, সম্প্রদায়, তথা সার্বিকভাবে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য লিঙ্গ সমতা এবং নারীদের ক্ষমতায়ন আবশ্যক। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে মহিলা ও কন্যাসন্তান। এরা মর্যাদা, স্বাধিকার, শান্তি না পেলে, কোনও দেশ, সমাজ ও পরিবার অগ্রসর এবং সুখী হতে পারে না।

শুধুমাত্র ভারত কেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই মহিলারা বৈষম্যের বলি। সব স্তরে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তারা বাদ পড়ছেন। কোণঠাসা ও ক্ষমতাহীন। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার চল থাকাতেই তাদের এ হাল। এই ব্যবস্থায় ধরা হয় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা উঁচু দরের। ভাবাদর্শ, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিষয়-আশয়ের লাগামটা পুরুষের হাতেই বেশি থাকে। পুরুষ প্রধান সমাজে মহিলাদের উপর চলে জোরজুলুম হিংসা। এটা এই সমাজ ব্যবস্থারই এক অঙ্গ। জোর-জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের হুমকি দিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রাখা হয়। রাষ্ট্রসংঘের কথায়, প্রতি তিন মহিলার মধ্যে একজনকে পড়তে হয় হিংসার মুখে। সোজাসাপটা কথায়, ১০০ কোটির বেশি মহিলা ও কন্যাসন্তানকে জোরজুলুমের শিকার হবার অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াতে হয়। বিশ্বজুড়ে চলছে সবচেয়ে বড় এই যুদ্ধ। যারপারনাই খেদের কথা, এর অধিকাংশটাই ঘটে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে।

ভারতে সব শ্রেণি কাঠামোয় নারীর ঠাঁই তলানিতে

নিজেদের মধ্যে হরেক ফারাক থাকায়, ভারতে মেয়েদের সম্পর্কে কোনও সাধারণ ধারণায় আসা সত্যিই কঠিন। শ্রেণি, জাতপাত, ধর্ম, গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও বলা যায়, অধিকাংশ মেয়ে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও ধ্যানধারণার ভুক্তভোগী। লিঙ্গ অসমতা ও দমন-পীড়নের শিকার। সমাজ ও মানব উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে পুরুষের চেয়ে তারা পিছিয়ে। ছেলের তুলনায় মেয়ের অনুপাত ভারতে সবচেয়ে কম। পুরুষের চেয়ে আয়ুষ্কালও অল্প। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাতে মেয়েরা ঢের পিছিয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ মেয়ের জোটে কম দক্ষতা ও অল্প রোজগারের কাজকর্ম। বিষয়-সম্পত্তির মালিকানায় তাদের অধিকার নেই বললেই চলে। কিছু ক্ষেত্রে সেই অধিকার থাকলেও তা নামে মাত্র। আসল রাশ থাকে পুরুষের হাতে। দেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। সেক্ষেত্রে মেয়েরাই হয়তো পরিবারের প্রধান। কিন্তু এ ধরনের পরিবারগুলি সচরাচর অতি দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশভাগ অত্যন্ত কম। মহিলা সাংসদের সংখ্যা এযাবৎ কখনও ১০ শতাংশের গণ্ডি ছাড়ায়নি। আইন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় পদে আসীন মহিলাদের দেখতে দূরবিন লাগে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক নিয়মবিধি তৈরিতে মেয়েদের বক্তব্য আমল পায় না তেমন একটা। এসব নিয়ম-কানুনই কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের বশে রাখে।

সর্বত্র না হলেও, ভারতের বহু জায়গায় ভয়ভীতি, দায়দায়িত্ব, বাধাবিঘ্নকে সাথী করে সারাটা জীবন কাটাতে হয় মেয়েদের। বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হওয়ার পাশাপাশি ঘরকন্না, বাচ্চাকাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি দায়দায়িত্ব-সহ বাড়ির বাইরের হরেক কাজের ঝক্কি-ঝামেলা তাদের সামলাতে হয়। ভয়ভীতি, আশঙ্কা-উদ্বেগ মেয়েদের জীবনে নিত্যসঙ্গী। এই ভয়ের শুরু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই। কন্যাসন্তান জেনে মাতৃগর্ভেই ভ্রূণহত্যা—যতি পড়ে যায় জীবনে। জন্মের পরও থাকে বিষ খাইয়ে তথা স্রেফ অবহেলা করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা। বেঁচে থাকলেও অযত্ন, অপুষ্টি, তথা চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। যৌন নির্যাতনও মেয়েদের তটস্থ করে রাখে। অশালীনভাবে গায়ে হাত দেওয়া থেকে শুরু করে ধর্ষণের ভয়। কড়া আইন পাসের পরও নৃশংস গণধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। বিয়ের পর আছে সঙ্গ না পাওয়া; বনিবনার অভাব, সামাজিক ও দৈহিক অত্যাচারের আতঙ্ক।

মহিলাদের জন্য কিছু সদ্‌র্থক পরিবর্তন হয়েছে। সৌজন্যে নারী আন্দোলনের প্রবল চাপ এবং সরকার ও সুশীল সমাজ সংস্থার তৎপরতা। এর নজির—লিঙ্গ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মেয়েদের যে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, সেই বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন মেনে নিয়েছেন সকলেই। মহিলাদের প্রতি জোর-জবরদস্তি হচ্ছে মেনে নিয়ে তার নিন্দা; সিদ্ধান্ত নেবার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সামিল করার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা; নারীদের জন্য আইনি ব্যবস্থা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগে দেখা গেছে উন্নতি। নীতি বিবৃতিগুলি এখন মেয়েদের প্রতি বেশ সংবেদনশীল। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও কর্মসূচিতে বাড়ছে অংশগ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা। পঞ্চায়েতেও এখন আগের চেয়ে বেশি মহিলাদের নির্বাচিত হতে দেখা যাচ্ছে। লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য সরকার গড়ে তুলেছে মহিলা কার্যালয়, আয়োগ, দপ্তর, মন্ত্রক। নারী-পুরুষ সমতার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে অবশ্য আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

ক্ষমতায়ন এক গতিশীল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

নারী-পুরুষ সমতার দিশায় এগোনোর জন্য ক্ষমতাহীন লিঙ্গ, অর্থাৎ, মহিলা ও কন্যাসন্তানদের ক্ষমতা দিতে হবে। কাউকে ক্ষমতা দিতে গেলে, ক্ষমতা জিনিসটা ঠিক কী, তা আগে বোঝা দরকার। অপরবশ হয়ে উদ্যোগ নেবার সামর্থ্যই হচ্ছে ক্ষমতা, অন্যদের নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করার সামর্থ্যই হল ক্ষমতা। ক্ষমতার অর্থ স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ বাছাই, বক্তব্য পেশের সুযোগ আয়ত্ত করা।

মানব সমাজে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বিষয়সম্পত্তি ও ধ্যানধারণার উপর নিয়ন্ত্রণ। বিষয়-আশায় ও ভাবাদর্শের (মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা ব্যবস্থা ইত্যাদি) নিয়ামকরাই হয়ে ওঠেন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী এবং পরিবার, গোষ্ঠী ও দেশের হর্তাকর্তা।

মহিলাদের ক্ষমতা বাড়াতে, তাই, পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও কাঠামোয় রদবদল দরকার। সম্পদে (প্রাকৃতিক, মানবীয়, বৌদ্ধিক, আর্থিক, আত্মিক) মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কায়েম এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি।

আমার মতে, ক্ষমতা সম্পর্কে এখনকার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন আমাদের জীবনের মান উন্নত করবে।

আমাদের ক্ষমতায়ন মানে অন্যের উপর ছড়ি ঘোরানো নয়, আমাদের এখনকার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য; এর অর্থ হওয়া উচিত ভবিষ্যতের ক্ষমতা, নিজের লোভ-লালসা, হিংসা প্রশমিত করার ক্ষমতা, অপরের দুঃখকষ্ট ঘোচানো, অন্যের প্রতি গুরুত্ব ও যত্নবান হওয়ার ক্ষমতা; সুবিচার ও নৈতিকতার জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা; বিচক্ষণতা ও অন্যের প্রতি সহানুভূতির লক্ষ্যে আত্মিক বিকাশ অর্জনের ক্ষমতা।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এক নিরন্তর ও গতিশীল প্রক্রিয়া। তাদের দমিয়ে রাখার কাঠামো ও ভাবাদর্শকে বদলে ফেলতে তা মহিলাদের সামর্থ্য বাড়ায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বিষয়সম্পদে নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে তাদের সাহায্য করে এই প্রক্রিয়া; নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও ক্ষমতা জোগায়, সক্ষম করে আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন অর্জনে। এ প্রক্রিয়া আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম পেতে সমর্থ করে; ফলত, তাদের নিজেদের তথা সামাজিক সত্তার বিকাশ ঘটে।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া হচ্ছে এক রাজনৈতিক পদ্ধতি; কেননা এর লক্ষ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সমীকরণ বদলে ফেলা।

কেবলমাত্র শ্রেণিকাঠামোগত লিঙ্গ সম্পর্ক পরিবর্তন করা মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। বরং শ্রেণি, জাতপাত, গোষ্ঠী, জাতি ও উত্তর-দক্ষিণ—সমাজের যাবতীয় শ্রেণিকাঠামোগত সম্পর্ক বদলে ফেলাই এর লক্ষ্য হওয়া সমীচীন। অন্যান্য ব্যবস্থা ও শ্রেণিকাঠামোর বদল ব্যতিরেকে, কেউ লিঙ্গ শ্রেণিকাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা লিঙ্গ সম্পর্ক কোনও শূন্যস্থানে কাজ করে না। এই নারী-পুরুষ সম্বন্ধ অন্যান্য সব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এসব ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত।

প্রকৃতির ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক সব মানুষ ও দেশের ক্ষমতায়ন থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন পৃথক নয় এবং হতে পারে না। সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তাই মহিলাদের লড়াই ও আন্দোলনের গভীর যোগাযোগ থাকা জরুরি। এসব ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন হচ্ছে একই লড়াইয়ের পৃথক পৃথক দিক, একই স্বপ্নের বিভিন্ন অংশ। সেজন্য এদের নিজেদের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ ও জোট থাকা চাই।

আমার বিশ্বাস, মহিলাদের ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ে কথা বলার সময়ে নারীবাদী চিন্তাভাবনা ও ভাবাদর্শ, সমতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং স্থায়িত্বের ক্ষমতায়ন সম্পর্কেও মুখ খোলা দরকার। অস্যার্থ, মহিলা মাত্রেই আমাদের সমর্থন পাবেন তা নয়। তার বক্তব্য যাচাই করে তবে ঠিক করা দরকার আমরা তাকে সমর্থন করব কিনা? মহিলা স্বৈরতন্ত্রী, মহিলা প্রাধান্য বিস্তারকামী, জাতপাতের পক্ষপাতী মহিলা—নারী বলেই আমরা তাদের ক্ষমতায়নে সায় দিই না। আমরা একথা মানি মহিলারাও আধিপত্যকামী হতে পারেন। পক্ষান্তরে, পিতৃতান্ত্রিক ও অন্যান্য শ্রেণিকাঠামোগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে সামিল হতে পারেন কিছু পুরুষ মানুষও। বস্তুত, এই সংগ্রামে অংশীদার পুরুষদের একাংশও। আমাদের লড়াই হচ্ছে কিছু নীতির জন্য এবং এমন এক সমাজের জন্য যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার থাকবে সমান সুযোগ।

নিছক মহিলাদের নয়, মহিলাদের প্রেক্ষিতের ক্ষমতায়ন দরকার, কারণ মহিলারা কোনও স্বতন্ত্র ক্ষেত্রবিশেষ নয়। যুদ্ধের জিগির, মানবাধিকার বা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন—প্রতিটি ইস্যুতে মেয়েদের আশঙ্কা উদ্বেগ, প্রেক্ষিত ও দর্শন জরুরি। প্রত্যেক ইস্যুই হচ্ছে মহিলাদেরও এক ইস্যুবিশেষ।

জোরদার ও ব্যাপকপ্রসারী হতে তথা রদবদল আনতে সক্ষম হতে গেলে, সব স্তর ও বিভাগে মহিলাদের ক্ষমতায়ন দরকার। তৃণমূল ও মাঝারি স্তরের মহিলা কর্মী, সরকারে নিযুক্ত মহিলা, প্রচার মাধ্যমের মহিলা কর্মী, মহিলা রাজনীতিক, মহিলা শিক্ষাবিদ, মহিলা শিল্পী, মহিলা উদ্যোগপতি—এদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বা সংযোগ থাকা জরুরি। আমরা চাই নিচু এবং উঁচুতলার কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়। সব স্তরে সহানুভূতিশীল পুরুষদের সমর্থনও আমাদের প্রয়োজন।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন কোনও একমুখী প্রক্রিয়া নয় যে কিছু কর্মী যাবে এবং অন্যান্যদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। এটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—আমরা অন্যদের ক্ষমতা বাড়াই এবং নিজেদের ক্ষমতায়ন করি। আমাদের সকলের জন্য এ এক অবিরাম যাত্রা। কেউ চিরকালের জন্য সমর্থ এবং তারপর অন্যান্যদের সক্ষম করে তোলার বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন বহুমাত্রিক ও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে :

● সমাজের জন্য মহিলাদের অবদানকে দৃষ্টিগোচর করা; অর্থাৎ দেখানো যে, সন্তান মানুষ করা এবং ঘরকন্না ছাড়াও, তারা চাষি, শ্রমিক, কারিগর, পেশাদার ইত্যাদি ইত্যাদি; শুধু আজ নয়, জনম জনম ধরে তারা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে তাদের চিরটাকাল বড়োসরো অবদান আছে। তারা জন্মদাত্রী, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালক ইত্যাদি।

● মহিলাদের ও সমাজকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, মেয়েদের ছিল এবং আজও আছে জ্ঞান, সক্ষমতা ও দক্ষতা। বিশেষত কৃষি, স্বাস্থ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে একথা বেশি খাটে।

● মহিলাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জোগানোর এক সামাজিক বাতাবরণ গড়ে তোলা।

● মহিলা ও কন্যাসন্তানকে তাদের নিজের যোল আনা সম্ভাবনা বোঝা এবং পছন্দ-অপছন্দ ঠিক করার সুযোগ দান ও গৎবাঁধা গুটিকয়েক ভূমিকা ও পেশায় ঠেলে না দেওয়া। সংসারধর্ম ছাড়াও বৃহত্তর অঙ্গণে নিজেকে মেলে ধরার জন্য মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

● নিজের জীবনের ব্যাপারস্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে মেয়েদের সক্ষম করা; বিয়েশাদি করবে কিনা, করলে কবে ও কাকে, বাচ্চাকাচ্চা হবে কিনা, হলে কবে, পড়াশুনো আদৌ চালিয়ে যাবে কি এবং কী নিয়ে পড়বে। এছাড়া, পরিবার, গোষ্ঠী ও দেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। রাজনীতির তামাম স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

● মহিলা ও কন্যাসন্তানের সাচ্চা চাহিদা, বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে তাদের মর্যাদা, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পুরুষ এবং মহিলাদের সচেতন করা।

● খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় তাদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে মহিলাদের জন্য সুযোগ-সুবিধে ও সহায়সম্পদের বন্দোবস্ত।

● আয় এবং বিষয়আশায়, অন্যান্য সম্পদ ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে মহিলাদের সাহায্য জোগানো।

বিশেষ নজর ও প্রচেষ্টার দাবিদার ইস্যুগুলি

মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রের উল্লেখ করা জরুরি। এসব দিকে আগে কিন্তু যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রগুলি মনোযোগ দিয়ে খতিয়ে দেখা দরকার। এবং সমস্যাদি সমাধানে খুঁজে দেখতে হবে উপযুক্ত স্ট্র্যাটেজি।

তাদের হীন অবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বিষয়সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদে মেয়েদের অধিকার নেই। এর দরুনই তারা সব সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। "এ ফিল্ড অফ ওয়ান'স ওন : জেন্ডার অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস ইন সাউথ এশিয়া" শীর্ষক বইটিতে বীণা আগরওয়াল বেশ বিশ্বাসযোগ্য সওয়াল করেছেন যে, সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে তাদের তেমন একটা দাবি না থাকা, মেয়েদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নে ক্ষতির সবচেয়ে বড় কারণ। এই ইস্যু মেটাতে সব স্তরে অবিলম্বে তৎপরতা দেখানো দরকার।

ভালো রোজগারের কাজকর্মে ঢোকার সুযোগের অভাব আর এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সংসারে টাকাকড়ি জোগাচ্ছে কে, এটা এক মস্ত ব্যাপার। রোজগেরে মানুষের কদর বেশি। লেখাপড়া শেখা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ মেলে না মেয়েদের। সে কারণে জোটে না তেমন কোনও কাজ। রোজগারের পথ বন্ধ বললেই চলে। মেয়েদের ঘরে কাজকর্মের কোনও দাম ধরা হয় না। টাকাকড়ি উপার্জন করে না বলে সংসারে তাদের দাম কম। মনে করা হয়, মেয়েরা এক বোঝা, এক ভার। গবেষণার মাধ্যমে অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বাইরে কাজকর্ম জুটিয়ে টাকা রোজগার করলে সংসারে মেয়েদের প্রতি বেজার ভাব কিছুটা কম হয় বইকি। তাদের তাই ধারণা, বিশ্বের বহু জায়গায় মেয়েদের বিশেষ বঞ্চনার মোকাবিলায় "অর্থকরী" অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ এক বড় বিষয়। ভারতে তাদের আয় উপার্জনের কাজকর্ম নিয়ে আমরা ঢের কথা বলেছি, এর অধিকাংশই মেয়েদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কাজের বোঝা বেড়েছে। আয় বাড়েনি খুব একটা। এই ইস্যুটি নিয়ে নড়েচড়ে বসা দরকার। গেরস্থালি ও বাচ্চা মানুষ করার কাজকর্ম ভাগ করে নেবার দিকটিও ভাবা প্রয়োজন, কেননা মেয়েদের গুরুত্ব খাটো করে দেখার সবচেয়ে বড় হেতুর ডেরা এখানেই। কাজের ঘানিতে মেয়েদের ঘুরতে হয় দিনরাত। রয়েবসে থাকার নেই এতটুকু অবকাশ। নেই পড়াশুনো, জীবনে উন্নতি করার সুযোগ। মহিলাদের সমতা ও ক্ষমতায়নের পথে এ এক বড় বাধা। বাড়ির অন্যরা সংসারের কাজে একটু হাত লাগালে, কলুর বলদ হওয়া থেকে কিছুটা রেহাই মেলে মেয়েদের। তাদের ক্ষণেক বিশ্রাম, নিজের জন্য একটু অবকাশ, অন্যান্য আগ্রহ মেটানোর সময় করে দিতে বাড়ির ছেলে ও পুরুষদের উচিত শিশু লালনপালনের কাজ ভাগ করে নেওয়া।

মহিলাদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আর একটি ক্ষেত্র যা নিয়ে চর্চা দরকার। চাই বিষয়টি বোঝা ও সমস্যাদি আসান করা। আগেভাগে বিয়ে, পর্দা, মেয়েদের চলাফেরায় বাধানিষেধের ঘেরাটোপ—এসবই মহিলাদের যৌন অধিকারে হস্তক্ষেপের রাস্তা। এগুলি মহিলা ও কন্যাসন্তানদের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধিকার খর্ব করে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল ভাবাদর্শ (এটা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, রীতিনীতি ও আচরণ ধাঁচের পক্ষে সাফাই গায় এবং এসব চিরতরে জিইয়ে রাখে। ভাবাদর্শের এক শক্তিশালী স্রষ্টা হচ্ছে প্রচার মাধ্যম। এবং আমরা সবাই জানি, অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম কতখানি নারীবিদ্বেষী। প্রচার মাধ্যমে মহিলাদের ভাবমূর্তি বদলানোর জন্য ঢের চেষ্টাচরিত্র চালানো সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত অবস্থার বরং অবনতি হয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের আর এক সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে ধর্ম। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারকারী ধর্মশাস্ত্র, পুরাণতত্ত্ব, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি আগে। এখন তো আরও বেশি করা জরুরি। এক্ষেত্রে আমাদের হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলা উচিত, কিন্তু এগোতে আমাদের হবেই। রাতারাতি এ ব্যাপারে পরিবর্তন হবে ভাবাটা ভুল। তবে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে বদল আসবে না কোনকালেই। জাতপাত, শ্রেণি, লিঙ্গভিত্তিক মর্যাদা কাঠামোর গুণগান করা ধর্মকে আজকের দিনে সমালোচনার মুখে দাঁড় না করিয়ে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া চলে না। আমাদের সাংবিধানিক আদর্শের বিরোধী, মহিলাদের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি না দেবার ধর্মীয় নিয়ম ও প্রথাগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জরুরি। ভাবাবেগ আহত হওয়া ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াতে এসব নিয়ম ও প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ কিভাবে করা হবে তা নিয়ে সতর্কভাবে আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা

মহিলাদের ক্ষমতায়নে শিক্ষাই হল সত্যিকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার বিষয়সূচি ও পদ্ধতি উভয়কেই নারীপন্থী হতে হবে।

পুরুষ-প্রধান সমাজের জ্ঞান, আদর্শ, মূল্য, নৈতিকতা, আচরণ ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। এজন্য মহিলাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও তথ্য অর্জনের চলতি প্রচেষ্টাগুলি জোরদার করা দরকার। চ্যালেঞ্জ জানাতে এগুলি মেয়েদের সাহায্য করবে। শুধুমাত্র পড়তে বা শব্দের মানে বুঝতে সাহায্য করবে এমন শিক্ষা নয়। আমাদের চাই সেই শিক্ষা যা কিনা পড়া, বোঝা ও আমাদের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করবে; নিছক পড়া, লেখা, আঁককষায় পারদর্শিতা যথেষ্ট নয় বরং নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং নিজ ভাগ্য নিজে গড়তে সাহায্য করবে মেয়েদের। দ্রুত বদলাতে থাকা জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণাত্মক কুশলতা অর্জন করতে মহিলাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে এমত শিক্ষাই আমাদের দরকার। এহেন শিক্ষা যা অমর্যাদা ও অমানবিকতার কাছে মাথা না নোয়ানোর ক্ষমতা ও আস্থা জোগাবে মেয়েদের। নারী সাক্ষরতার সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকলে দেখতে হবে শিক্ষণ যেন চেতনা বাড়ানোর কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই শিক্ষার ক্লাস মহিলাদের শক্তিশালীগোষ্ঠী গড়তে সাহায্য করবে। নিজের জীবনের উপর আরও বেশি করে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারা, বৈষম্য-অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ না লাগিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা হবে এর লক্ষ্য। এসব ক্লাস মেয়েদের আরও স্বাধীনতার বাতাবরণ তৈরি করবে। তা মানুষ হিসেবে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের আরও বেশি সুযোগ করে দেবে। মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষাকে হতে হবে সমষ্টিগত তৎপরতা ও চিন্তাভাবনার এক অবিরাম প্রক্রিয়া।

মহিলাদের বর্তমান জ্ঞান ও দক্ষতায় ভর করে আমাদের শিক্ষার প্রচেষ্টা চালানো উচিত; নারীত্বে নিশ্চিত প্রত্যয় রেখে এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে প্রতিটি মেয়ের সেরাটা বের করে আনা।

মহিলাদের শিক্ষার পদ্ধতিকে হতে হবে অংশগ্রহণমূলক ও অ-শ্রেণিকাঠামোগত। নিজেদের অ্যাজেন্ডা ও অগ্রাধিকার বাছাইয়ে মেয়েদের জড়িত করা জরুরি। হতাশা ছুঁড়ে ফেলে, শিক্ষা প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে একটা ভালো অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। তাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে। উন্মেষ ঘটাবে তাদের সৃজনশীলতার, তাদের মধ্যে এনে দেবে উদ্যমী ও হাসিখুশি-প্রাণোচ্ছল হবার অনুভূতি; এক কথায়, ক্ষমতা বা অধিকার দেবে তাদের।

নিছক নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান অনুসন্ধান এবং অর্জন নয়, আমরা চাই এমন শিক্ষা যা দলিতগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায়বিচার, সমতা, সততা, সত্যবাদিতা এবং সংহতির মতো মূল্যবোধ অর্জন এবং জোরদার করতেও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। বিভিন্ন স্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে তাদের নানাবিধ সংগ্রামে নামতে উদ্যম জোগাবে মেয়েদের।

আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়া নয়, আমরা চাই মেয়েদের মধ্যে আস্থা ও সংহতি গড়ে তোলার শিক্ষা। এমন শিক্ষা যা বিভিন্ন স্তরে সমিতি সমন্বয় (নেটওয়ার্ক) গঠনে তাদের সাহায্য করবে।

এর উচিত বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন করার মননশীলতা এবং চারদিকের বাস্তবতা বোঝার জন্য এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে মহিলাদের সাহায্য করা। ছোট ও বড় বাস্তবতা, ছোট বাস্তবতা ও বড় নীতি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সম্পর্কের তত্ত্বতালাশ করতে তা মেয়েদের সহায়তা করবে।

স্রেফ পুনরাবৃত্তি, মহিলাদের ক্ষমতায়নকে অবশ্যই মানবিক মূল্যবোধের ক্ষমতায়নের সঙ্গী হতে হবে। কেবল তা হলে, আমাদের চারপাশে থাকবে আরও বেশি সমতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন পুরুষের পক্ষেও ভালো এবং পরিবার ও জাতির জন্য শুভ, পুরুষরা একথা বুঝলে মেয়েদের ক্ষমতা বাড়বে দ্রুতগতিতে। আসুন, স্মরণ করা যাক,

পুরুষ হলে গুণময় সমতায় ভীত নয়।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক বিশিষ্ট নারীবাদী। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত—কাজ করে চলেছেন মেয়েদের উন্নয়নের জন্য। ইমেল : kamla@sangatsouthasia.org; sangat.sangat@jagori.org)

মহিলাদের ক্ষমতায়ন : সক্রিয় সরকার

*মেয়েরা আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। সমতা এবং সর্বজনীন বিকাশের কথা বলা সত্ত্বেও মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং অবহেলার শিকার। এটা দূর করার জন্য দরকার নারীর ক্ষমতা বাড়ানো। সরকার এ নিয়ে এখন অনেক সজাগ ও সক্রিয়। মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের লক্ষে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই নিবন্ধে। লিখেছেন—***লীনা নায়ার**

লিঙ্গসাম্য বা নারী-পুরুষ সমতার উল্লেখ আছে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য ও নির্দেশাত্মক নীতিতে। শুধুমাত্র সমতা মঞ্জুর করেই ছেড়ে দেয়নি, সংবিধান রাষ্ট্রকে ক্ষমতাও দিয়েছে মহিলাদের অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণের। এই সমতা ও সর্বজনীন বিকাশের নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং শিশুদের সযত্নে মানুষ করে তোলার জন্য চলে সব রকম চেষ্টা। এই নারী ও শিশুরাই আমাদের দেশে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। যাতে করে মেয়েদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যায়।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এক গোলকধাঁধা বিশেষ। এর কত না নির্দেশক (ইনডিকেটর)! এই নিবন্ধে তাই, মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সেইসঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারের মূল পদক্ষেপগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (অর্থনৈতিকও বটে) জনিত অবস্থার উন্নতি করা গেলে, তবেই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সার্থক হয়েছে বলা যাবে।

স্বাস্থ্য

বহু কোটি মানুষ, বিশেষত গরিব ও অবহেলিতদের জন্য উন্নত ও সাধ্যায়ত্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বন্দোবস্ত করাটা সহজ নয়, ভারত সরকারের পক্ষে এ এক দারুণ কঠিন কাজ। ২০০৫ সাল ইস্তক, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে আরও ভালো পরিকাঠামো, ওষুধ, সাজসরঞ্জাম ও মানবসম্পদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা জোগান-এর বিকাশ ঘটাতে নেতৃত্ব দিয়েছে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এন আর এইচ এম)। এখন এর নাম বদলে করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন।

"মেয়েদের এক বড়োসড়ো অংশ ভুগছে অপুষ্টিতে। প্রতি তিন নারীর এক জন অপুষ্টির শিকার। মেয়েদের অর্ধেক রক্তাল্পতার রুগি। প্রসূতি ও শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ঘোচাতে সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস) সর্বজনীন ও জোরদার করা হয়েছে। শিশু পরিচর্যা ও বিকাশের জন্য এহেন প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম। চোদ্দ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে দেশের সব জেলা ও ব্লকে চলছে এই প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ।"

বেঁচেবর্তে থাকার মানের সূচকের উন্নয়নে স্বাস্থ্য এক পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল পাওয়ার সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চালিয়ে যেতে হবে। ভারতে প্রসূতিদের পুষ্টির অভাব এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। এদের এক-তৃতীয়াংশের বেশির (৩৫.৬ শতাংশ) বডি মাস ইনডেক্স কম।

মেয়েদের এক বড়োসড়ো অংশ ভুগছে অপুষ্টিতে। প্রতি তিন নারীর এক জন অপুষ্টির শিকার। মেয়েদের অর্ধেক রক্তাল্পতার রুগি।[1] প্রসূতি ও শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ঘোচাতে **সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস)** সর্বজনীন ও জোরদার করা হয়েছে। শিশু পরিচর্যা ও বিকাশের জন্য এহেন প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম। চোদ্দ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে দেশের সব জেলা ও ব্লকে চলছে এই প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী ১ কোটি ৯০ লক্ষ মহিলা এবং ৬ বছর পর্যন্ত বয়সী ৮ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুর[2] পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ভারতের অঙ্গীকারের প্রতীক এই প্রকল্প। প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গ্রামেগঞ্জে পালন করা হয় **গ্রামীণ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি দিবস**।

প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত[3] দ্রুত কমানোর জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে আছে : হাসপাতাল ও মাতৃসদনের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সন্তান প্রসবে মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য **জননী সুরক্ষা যোজনা**। সরকারি চিকিৎসালয়ে বিনা খরচে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার-সহ যে কোনও প্রসবের জন্য **জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম**। মা ও শিশুর পরিষেবা জোগানোর উপর নজরদারি চালাতে আছে **মা ও শিশু ত্রাণ কার্ড** (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রটেকশন কার্ড)। প্রতিষেধক পরিষেবা-সহ গর্ভাবস্থা ও প্রসব-পরবর্তী কালে পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে **মা ও শিশুর খোঁজ রাখার ব্যবস্থা (মাদার**

অ্যান্ড চাইল্ড ট্র্যাকিং সিসটেম)। প্রসবকালীন পরিচর্যার মান উন্নত করতে এবং উপযুক্ত স্তরে সংশোধনকারী ব্যবস্থা নেবার জন্য **প্রসূতি মৃত্যু পর্যালোচনা (মেটারনাল ডেথ রিভিউ)**। এসব প্রচেষ্টার দরুন বেশ কিছুটা এগোনো গেছে।[4] ২০০৭-০৯-এ প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত ছিল প্রতি এক লক্ষে ২১২। রেজিস্টার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী তা কমে ২০১০-১২-য় দাঁড়িয়েছে ১৭৮।

তেরোটি রাজ্যে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (এন এফ এইচ এস-৪)[5] অধুনাতম (২০১৫-১৬) তথ্য থেকে প্রমাণ মিলেছে যে গর্ভাবস্থা ও প্রসবের সময় পরিচর্যা ব্যবস্থাদি আরও ভালো হওয়ার দেশে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু কমেছে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, নার্সিং হোমের মতো প্রতিষ্ঠানে প্রসবের জন্য ভর্তি হচ্ছেন আগের চেয়ে আরও বেশি বেশি মহিলা। গত দশকে কয়েকটি রাজ্যে এর হার তো বেড়েছে দু' গুণেরও বেশি। প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা মেটানোর দিনে খেয়াল রেখেছে ২০১৫-র **খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিও**। এতে পুরুষদের বন্ধ্যাকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা

মেয়েদের মানমর্যাদা বাড়ানোর সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও উপযুক্ত দক্ষতা বিকাশের জন্য সরকার হাতে নিয়েছে অনেক কর্মসূচি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ ও কারিগরি সব ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই আছে সরকারি কর্মসূচি। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিয়ে ২০১০-এর এপ্রিলে চালু হয়েছে **শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯**। এই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক। প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দিতে চালু হয় **সর্বশিক্ষা অভিযান**। এসবের মোদ্দাফল, কি গ্রাম কি শহর, দেশজুড়ে গত কয়েক বছর ধরে স্কুলে মেয়েদের নাম লেখানো বেড়েই চলেছে। কমেছে বিদ্যালয়-ছুটের হার। জাতীয় পর্যায়ে, প্রাথমিক স্কুল স্তরে লিঙ্গ সমতা সূচক—জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্স হচ্ছে ১.০ এবং উচ্চ-প্রাথমিকে ০.৯৫ (জেলা শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থার ২০১২-১৩-র হিসেবে)। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্য মেনে নিয়েও, বলা দরকার যে উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই আরও অনেক কিছু।[6] প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য পড়া, লেখা, ভাষা বোঝা, অঙ্ক কষা বিশ্বমানের সমতুল করে তুলতে সর্ব শিক্ষা অভিযানের আশায় দেশজুড়ে চালু হয়েছে **পড়ে ভারত, বড়ছে ভারত**[7] উপ-কর্মসূচি। পড়ে ভারত, বাড়ছে ভারত-এর লক্ষ্য প্রতিটি স্কুলে ২০০ দিন (৮০০ ঘন্টা) লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। সর্বশিক্ষা অভিযানের আর একটি উদ্যোগ **বিদ্যাঞ্জলি (স্কুল স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি)**। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমাজ ও বেসরকারি ক্ষেত্রকে আরও বেশি যুক্ত করা এর উদ্দেশ্য। স্কুলের কাজকর্মে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নেবার কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা।

"উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও উপযুক্ত দক্ষতা বিকাশের জন্য সরকার হাতে নিয়েছে অনেক কর্মসূচি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ ও কারিগরি সব ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই আছে সরকারি কর্মসূচি। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিয়ে ২০১০-এর এপ্রিলে চালু হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯। এই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক। প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দিতে চালু হয় সর্ব শিক্ষা অভিযান। এসবের মোদ্দাফল, কি গ্রাম কি শহর, দেশজুড়ে গত কয়েক বছর ধরে স্কুলে মেয়েদের নাম লেখানো বেড়েই চলেছে। কমেছে বিদ্যালয়-ছুটের হার।"

সর্বশিক্ষা অভিযানের সুবাদে, মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সী সব ছেলেমেয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও তার মানের উন্নতি করতে, ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে **রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান**। মেয়ে পড়ুয়াদের জন্য **উড়ান** নামে এক বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই)। ইনজিনিয়ারিং-এ মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানো এবং সবার জন্য বিনা খরচে অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শেখানো ও পড়ায় উৎসাহ জোগানো এর উদ্দেশ্য।[8] উড়ান প্রকল্পে ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা আছে। এসব প্রচেষ্টার সুফলও মিলেছে বৈকি। ২০০১-এর ৬৫.৩৮ শতাংশ থেকে ২০১১-তে নারী সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.০৪ শতাংশ।

উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য রূপায়িত হচ্ছে **রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান**। উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রদের ঋণ দেবার জন্য **প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী কার্যক্রমের** আওতায় সরকার চালু করেছে বিদ্যালক্ষ্মী নামে ওয়েব-ভিত্তিক এক পোর্টালও (www.vidyalakshmi.co.in)। তথ্য পাওয়া এবং ব্যাংক ও সরকারের কাছে শিক্ষা ঋণের জন্য আবেদন জানাতে ছাত্রদের এক জানলা সুবিধার ব্যবস্থা করতে এ ধরনের পোর্টাল এই প্রথম।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। উচ্চশিক্ষাতেও তাদের কৃতিত্ব তারিফ করার মতো। নারী-পুরুষ পক্ষপাত কিন্তু এখনও মুছে ফেলা যায়নি। যুবাদের লিঙ্গসাম্য সম্পর্কে সংবেদনশীল ও মেয়েদের অধিকার ও মূল্য সম্পর্কে ইতিবাচক সামাজিক রীতিনীতির চলন বাড়াতে কলেজে কলেজে **লিঙ্গ প্রবক্তা** (জেন্ডার চ্যাম্পিয়নস) নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় ও

কলেজে এব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি ও নীতিনির্দেশিকা পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

সবাইকে অংশীদার করে সমাজ গঠন ও উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ সমতা এবং মেয়েদের প্রতি বৈষম্য ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের জাতীয় প্রয়াসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মেয়েদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের হিংসা গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে সরকার বদ্ধপরিকর। এজন্য তৈরি করেছে প্রয়োজনীয় আইনও। ভুক্তভোগী মহিলাদের সহায়তা এবং তাদের সুরক্ষার জন্য পুলিশ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে সুদক্ষ করে তোলার উপর সরকার খুব গুরুত্ব দিয়েছে। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার মেয়েদের বক্তব্য শোনা ও তাদের ন্যায়বিচার পাওয়া সুনিশ্চিত করতে সরকার সব রকম ভাবে সচেষ্ট।

কাজকর্ম, জীবনযাপন ও তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্য নিরাপদ আবহের ব্যবস্থা করতে সম্প্রতি তৈরি কয়েকটি আইনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ধর্ষণের মতো অপরাধে আরও কড়া সাজা ও যৌন হামলা এবং লাঞ্ছনার সংজ্ঞার পরিসর আরও বাড়িয়ে তৈরি হয়েছে **ফৌজদারি বিধি (সংশোধন), আইন ২০১৩।** অ্যাসিড হামলা, যৌন হয়রানি, মহিলাদের গোপনীয়তায় আড়িপাতা ও অসদুদ্দেশ্যে তাদের পিছু নেওয়া, কোনও মহিলাকে বিবস্ত্র করার মতো নতুন ধরনের অপরাধ ভারতীয় দন্ডবিধিতে ঢোকানো হয়েছে। হিংসার শিকার মহিলার দ্রুত ত্রাণের জন্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের আরও দায়িত্ববোধের সংস্থানও আছে এ আইনে। এদের মধ্যে পড়েন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও। **কর্মস্থানে মেয়েদের যৌন হেনস্থা (রোধ, নিষেধ ও প্রতিবিধান) আইন, ২০১৩**-এর লক্ষ্য কাজের জায়গায় মহিলাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশের ব্যবস্থা। এছাড়া, প্রচলিত আইনগুলিতো আছেই। যেমন, গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মেয়েদের রক্ষা আইন, ২০০৫; পরিবারের মধ্যে যে কোনও ধরনের হিংসার শিকার যে সব মহিলা তাদের অধিকার রক্ষা; বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৬; যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের রক্ষা আইন, ২০১২; গর্ভাধানের আগে বা পরে লিঙ্গ বাছাই নিষেধ। সংসদে পাস **প্রসূতি কল্যাণ (সংশোধন) বিল, ২০১৩** মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ থেকে বাড়িয়ে করেছে ২৬ সপ্তাহ।

"বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির আরও লক্ষ্য, কন্যাশিশুর কল্যাণ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা, কন্যাশিশুর অনুপাত কমতে থাকা রোখা এবং মহিলাদের ক্ষমতা বাড়ানো। এই কর্মসূচির সুবাদে কন্যাশিশুদের বিকাশে স্থানীয় স্তরে গড়ে উঠেছে গন্ডা গন্ডা উদ্যোগ। উৎসাহজনক ফল এবং রূপান্তরে এর সম্ভাবনার দরুন, কর্মসূচিটি কন্যাশিশুর অনুপাত কম এমন আরও ৬১-টি জেলায় চালু করা হয়েছে। গোড়াতে এই কর্মসূচির আওতায় ছিল ১০০-টি জেলা।"

মহিলাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজিক দিক—রোধ, রক্ষা ও পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে সরকার গড়ে তুলেছে নির্ভয়া তহবিল। এই তহবিলের আওতায় এযাবৎ ১৬-টি পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি টাকার মতো বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে **ওয়ান স্টপ সেন্টার।** হিংসায় কবলে পড়া মেয়েদের চিকিৎসায় সাহায্য, পুলিশি সহায়তা, আইনগত সাহায্য, মানসিক-সামাজিক কাউন্সেলিং ও অস্থায়ী আশ্রয় দেবে এই সেন্টার। ২৪ ঘন্টা খোলা **উইমেন হেল্পলাইন।** দেশের প্রতিটি পুলিশ জেলায় মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তদন্ত ইউনিট। নিরাপত্তা জোরদার করতে ট্রেনের কামরায় সি সি টি ভি নজরদারি ক্যামেরা, ন্যাশনাল এমার্জেন্সি রেসপন্স সিস্টেম, সেন্ট্রাল ভিকটিম কমপেনসেশন ফান্ড, মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ দমন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির আরও লক্ষ্য, কন্যাশিশুর কল্যাণ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা, কন্যাশিশুর অনুপাত কমতে থাকা রোখা এবং মহিলাদের ক্ষমতা বাড়ানো। এই কর্মসূচির সুবাদে কন্যাশিশুদের বিকাশে স্থানীয় স্তরে গড়ে উঠেছে গন্ডা গন্ডা উদ্যোগ। উৎসাহজনক ফল এবং রূপান্তরে এর সম্ভাবনার দরুন, কর্মসূচিটি কন্যাশিশুর অনুপাত কম এমন আরও ৬১-টি জেলায় চালু করা হয়েছে। গোড়াতে এই কর্মসূচির আওতায় ছিল ১০০-টি জেলা।

মহিলা পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও কয়েকটি রাজ্য তাদের পুলিশ বাহিনীতে মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ সংরক্ষিত করেছে। প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীর লিঙ্গসাম্য সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে খোলা হয়েছে মহিলা পুলিশ থানা। পুলিশ ও মহিলাদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলতে, বিশেষত তৃণমূল স্তরে, মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এসব স্বেচ্ছাসেবকের কাজ হবে গার্হস্থ্য হিংসা, বাল্য বিবাহ, পণ নিয়ে নির্যাতন ইত্যাদির মতো ঘটনা কাছেপিঠের থানায় জানিয়ে দেওয়া।

আর্থিক নিরাপত্তা

বিস্তর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, পুরনো সব বাধাবিঘ্ন ঘুচিয়ে তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে নিচ্ছে এদেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর মতো প্রধান কর্মসূচিগুলি গ্রামের হাজার হাজার মেয়েকে জীবিকার নিরাপত্তা জোগানোর পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতার ব্যবস্থা করেছে। তৈরি হয়েছে গ্রামের সম্পদ। অর্থনীতির মূলধারায় মেয়েদের নিয়ে আসার আর একটি উদাহরণ, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ। এই কোষ শুধুমাত্র গরিব মহিলাদের জন্য। তাদের নিয়মিত

তহবিল জোগায় এবং বাজারের সঙ্গে যোগাযোগে সাহায্য করে। গরিব মহিলা উদ্যোগ ও স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলির চাহিদা ও আশা-আশঙ্কা মেটাতে এই কোষ এক নতুন উদ্যোগ **মহিলা ই-হাট** শুরু করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির এই ওয়েব ভিত্তিক বিপণন উদ্যোগ মহিলাদের আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকতে এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের বন্দোবস্ত করবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। লক্ষ লক্ষ মেয়েকে তাদের প্রথম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করেছে **প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা।** গরিবি ও ঋণের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে এ এক বড়ো সাফল্য। গ্রেটস ফাউন্ডেশনের তৃতীয় বার্ষিক সমীক্ষার হিসেব, এখন এই যোজনার আওতায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ৪৭ শতাংশ নারীর।[9] জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নীতিতে মেয়েদের দক্ষতা ও কর্মে নিযুক্তির উপযুক্ততার বিকাশ ঘটাক, মহিলা কর্মী নিয়োগকারী ক্ষেত্রগুলির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। গরিবি দূর করতে ভদ্রগোছের আয়ের কাজ জোগাড়ে মেয়েদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চালু হয়েছে **মেয়েদের কৌশল বিকাশ যোজনা।** কন্যাশিশুর আর্থিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার তাগিদে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও উদ্যোগের অধীনে চলছে **সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা** নামে এক ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প। এই যোজনায় ২০১৬-র জুন ইস্তক খোলা হয়েছে ৮৭ লক্ষ অ্যাকাউন্ট।

পরিশেষ

এহেন এক বিশাল, বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব অবশ্যই এগিয়ে যাবার পথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যদিও, পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষপ্রধান সমাজের মানসিক গড়ন এখনও এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এই মানসিক গঠনের দরুন পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের মতো বিভিন্ন দিকে মেয়েদের সমতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। মহিলাদের বিরুদ্ধে চলে হিংসা। এসব রুখতে ইতোমধ্যে শুরু করা প্রক্রিয়াগুলি জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর স্ট্র্যাটেজি এক অবিরাম প্রচেষ্টা এবং **মহিলাদের জন্য নয়া জাতীয় নীতিতে** এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণ, আবাসন ও পরিকাঠামো, নিরাপদ পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, গণ মাধ্যম ও ক্রীড়া, সামাজিক নিরাপত্তা ও সহায়তা পরিষেবা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পরিবেশের মতো সাতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের রূপরেখা আছে খসড়া নীতিতে। মেয়েদের জন্য সাইবার স্পেস নিরাপদ রাখা, ঘরকন্না ও ছেলেমেয়ে মানুষ করার মতো বিনা পয়সার কাজ কমানোর জন্য নারী-পুরুষের ভূমিকার পুনর্বন্টন, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণে মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, একা থাকা নারীর চাহিদার স্বীকৃতি এবং উদ্যোগ স্থাপনের মতো কাজকর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ইত্যাদির মতো নতুন উঠে আসা ইস্যু সরকার মেনে নিয়েছে। স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের (সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোলস) কথা মনে রাখলে, সত্যিকারের সর্বজনীন, ন্যায্য, জনগণ-কেন্দ্রিক এবং রূপান্তরযোগ্য ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন অ্যাজেন্ডার লক্ষ্য অর্জনে লিঙ্গের প্রেক্ষিতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র সুশীল সমাজ ও অ-সরকারি ক্ষেত্র-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও অবদানের মাধ্যমে।❑

"মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানোর স্ট্র্যাটেজি এক অবিরাম প্রচেষ্টা এবং মহিলাদের জন্য নয়া জাতীয় নীতিতে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণ, আবাসন ও পরিকাঠামো, নিরাপদ পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, গণ মাধ্যম ও ক্রীড়া, সামাজিক নিরাপত্তা ও সহায়তা পরিষেবা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পরিবেশের মতো সাতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের রূপরেখা আছে খসড়া নীতিতে।"

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক ভারত সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সচিব। ইমেল : secy.wcd@nic.in)

উল্লেখপঞ্জী :

[1] 5NFHS-III (2005-06) : "International Institute for Population Sciences (lIPS) and Macro International, 2007", National Family Health Survey (NFHS-3), 2005-06 : India, Vol I (Mumbai : IIPS)

[2] http://wcd.nic.in/sites/defaultlfiles/AR20l4-l5.pdf.Annexure XII, p.l80

[3] Refers to the number of women who die as a result of complications of pregnancy or childbearing in a given year per 100,000 live births in that year and Maternal Mortality Rate is defined as the number of maternal deaths to women in the ages 15-49 per lakh of women in that age group (Maternal Mortality Ratio (MMR) বা প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত বলতে বোঝায়, কোনও নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম পিছু প্রসূতি মায়েদের মৃত্যুর সংখ্যা, যারা গর্ভবস্থাকালীন তৈরি হওয়া জটিলতার ফলস্বরূপ মারা গিয়েছেন। এবং Maternal Mortality Rate (MMR) বা মাতৃমৃত্যু হার বলতে বোঝায় ১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রতি লক্ষ মহিলা পিছু ওই একই বয়সী মেয়েদের প্রসবজনিত জটিলতার কারণে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের ৮০ দিন পর পর্যন্ত সময় পর্বের মধ্যে মৃত্যু।)

[4] http://pib.nic.in/newsitelPrintRelease.aspx?relid=123669

[5] http://pib.nic.in/newsitelPrintRelease.aspx?relid=134608

[6] http://indiabudget.nic.in/es2013-14/echap-13.pdf

[7] http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Padhe-Bharat-Badhe-Bharat.pdf

[8] http://cbseonline.nic.in/regn/udaan,html

[9] http://indiatoday.intoday.inIstory/pmjdy-heJped-more-women-financially-empowered-reportll1708404.html

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

*সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের কোনও ভূমিকা নেই এবং সম্পদ যাদের হাতের নাগালের বাইরে, দারিদ্র্য তেমন মানুষজনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণবিশেষ। দারিদ্র্যের এই ক্ষমতাহীন দশা কেবল কিছুটা পরিমাণ ঘোচানো যায় অংশগ্রহণ বা আলাপচারিতার যোগদানের মধ্যে দিয়ে। জীবনের সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার ওপর আদপে এর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। যখনই ক্ষমতাহীনতার রূপভেদ হিসাবে দারিদ্র্যকে দেখা হয়, তার সমাধানকল্পে আমরা একে পন্থা হিসাবে দেখতে শুরু করি। ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে, বিশেষত মহিলাদের। এযাবৎকালীন মেয়েদের কেবল যখন দরকার তখনই পাওয়া যায়, এমন এক সস্তায় লভ্য সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে আসা হচ্ছিল। কিন্তু, না, মেয়েরা গোটা বিশ্বের সম্পদ—তা উপলব্ধি করার উপযুক্ত হতে হবে দুনিয়াকে। চিরকাল সুসময়ে এবং দুঃসময়ে ঘাত-প্রতিঘাত সহন করতে থাকবে মেয়েরা—এ আর চলতে দেওয়া যায় না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হিসাবে অনেক তো দিন কাটানো গেল, এবার থেকে মেয়েদের অংশীদারের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। মেয়েদের এই যাত্রা পথে, লক্ষ্য তো আছেই, সঙ্গে জড়িত আছে মূল্যবোধও। এ পথে হাঁটার সময় প্রতি পদে সামনে নতুন নতুন বাঁক আসবে এবং এভাবেই শেখার কাজটা চলতেই থাকবে। এই প্রক্রিয়াটিই হল ক্ষমতা অর্জনের স্বরূপ। লিখেছেন—***ইলা আর ভাট***

ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে একদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। ঠিক সেই সময়পর্বে আমিও ছোটো থেকে বড়ো হয়ে উঠেছি। যুব সমাজের প্রতিভূ হিসাবে, জাতির পুনর্গঠন, তথা নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে আমরা ছিলাম অঙ্গীকারবদ্ধ। যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ এই স্বাধীনতার স্বাদ সঠিক অর্থে পায়। মহাত্মা গান্ধী আমাদের পথ দেখান। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি তুল্যমূল্য বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে শৌচালয়ের ও গ্রামের পুকুরের সাফসাফাই ছিল আধ্যাত্মিক মুক্তির সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা অর্থনীতিকে দেখতে শিখেছিলাম আমজনতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের এবং SEWA-র ক্ষেত্রেও মার্গদর্শনের দিশারী হিসাবে কাজ করেছে।

প্রথমত, সরলতা। কারণ জটিলতা যোগ করলেই যে তা প্রগতির সমার্থক হয় না, আমরা তা উপলব্ধি করেছিলাম। দ্বিতীয়ত, অহিংসা। স্বাধীনতালাভের পরও হিংসার সঙ্গে সংস্রব রাখাটা বেমানান। তৃতীয়ত, শ্রমের মর্যাদা। শ্রমের পবিত্রতা। শ্রম হল প্রকৃতির বিধান এবং তাকে অবহেলা করার মধ্যেই বর্তমানের এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ নিহিত। চতুর্থ হল মূল্যবোধ—যা একজন ব্যক্তির মানবিকতার সঙ্গে কোনরকম আপস করে না এবং সেই কারণেই তা গ্রহণযোগ্য। সরলতা, অহিংসা, শ্রমের পবিত্রতা এবং মানবিক মূল্যবোধ—এই চার ভিত্তিস্তম্ভই আমাদের ভারতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে দিশা দেখিয়েছে।

আমাদের চিন্তাভাবনা মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় বলেই, আমরা যারা SEWA-র সঙ্গে যুক্ত ধীরে ধীরে বুঝতে পারি উন্নয়নের ধারণা হল সার্বিক ও সংহত বিষয়। উন্নয়নের সুস্পষ্ট ধারণালাভের পর আমরা একে সর্বদিক থেকেই গঠনমূলক কাজ বলে চিহ্নিত করে থাকি। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ওপর, সমাজের ওপর এবং বিশ্বের ওপর যে প্রভাব ফেলে তার সাথে একাত্ম করে দেখি এবং এভাবেই এক দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠি। এই ধরনের যোগসূত্রই আমাদের SEWA এবং SEWA-র আন্দোলনের মূল বনিয়াদ।

আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের স্থানটি দখল করে আছে 'কর্ম' বা কাজ। এই 'কাজ'-কে আমি মানুষের জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখতে চাইব। এ হল সেই কাজ, ফলপ্রসূ কাজ, যা বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায়। দরিদ্র মহিলাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, তাদের জীবনটাই কাজকেন্দ্রিক। এই কাজই তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছে। একজন ব্যক্তির পরিচয় গড়ে দেয় তার কর্মদক্ষতা। রুজি-রোজগারের সংস্থান করে, ফলত, পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটি সমাজ, একটি জাতি। কিন্তু দারিদ্র্য এই ভারসাম্যকে তছনছ করে দেয়। প্রতিটি স্তরে শোষণ চাক্ষুষ করছি। ব্যক্তি বিশেষকে শোষণ, শ্রেণিকে শোষণ তথা পরিবেশ, প্রকৃতিকে শোষণ।

দারিদ্র্য থাকলেই, আমরা ধরে নিই প্রতিটি পর্যায়ে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। তা হতে পারে শ্রেণি, জাতপাত, বর্ণ, ধর্ম, জমির মালিকানা, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির মতো আরও বহু কিছুর ভিত্তিতে। ফলে, আমাদের মধ্যে তৈরি হয় দুর্বলতা, তা হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, তথা আধ্যাত্মিক। মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বিপথে চালিত বিশ্বাসকে

আঁকড়ে ধরে। দারিদ্র্য হল সমাজ স্বীকৃত স্থায়ী হিংসাত্মক পরিস্থিতি। দারিদ্র্য এবং স্বাধীনতাহীনতা দু'টি আলাদা বস্তু নয়। যতখানি অধিকার তার দরিদ্রতম নাগরিক ভোগ করতে সমর্থ, একটি দেশও ঠিক ততটাই স্বাধীনতার হকদার। দরিদ্র মানুষজন, মহিলাদের বিষয়ে তথা নিজের কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। অতএব, মহিলা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য আমাদের চোখে পড়ছে।

SEWA-তে, আমরা যে মহিলাদের নিয়ে কাজ করি, তারা বড় দুর্বল, কিন্তু সামর্থ্য অর্জনের জন্য একজোট।

কাজকর্মের প্রয়োজনে দেখা সাক্ষাৎ করে আমরা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলি। আমাদের কাজের ক্ষেত্রে দরকারি চাহিদা পূরণের জন্য ইউনিয়ন গড়ে তুলি। উদ্দেশ্য ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, দেশের সরকার, বিশ্ববাসী, তথা প্রথাগত 'ব্যবস্থাপত্র', 'কাঠামো'-র দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া। নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে SEWA-এ একসাথে আমরা একটা ব্যাংক তৈরি করেছি। সঞ্চয়, ঋণ নেওয়া, ঋণ দেওয়া, সম্পদ সৃষ্টি, জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্য পূরণ করতে আমরা এই ব্যাংকের দ্বারস্থ হই। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে আমরা একসঙ্গে সমবায় বানিয়ে এগিয়ে এসেছি। প্রসূতিদের প্রয়োজন মেটানো তথা স্বাস্থ্য ও জীবনবিমার জন্য গড়ে তুলেছি একটি 'সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক'। সারা বিশ্বের মহিলা কৃষক ও মহিলা কারিগরদের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সংস্থান করে দিতে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছি। নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে চালানো তথা বাইরের দুনিয়ায় এক ইতিবাচক ছাপ ফেলতে আমরা স্কুলও গড়ে তুলেছি।

SEWA একটি প্রকল্পমাত্র নয়। কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষ নয়। এমনকি শুধু অর্থনীতি বা অর্থ বিষয়কও নয়। যা হাতে আছে এবং যা এখনও অর্জন করা বাকি—এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই SEWA। এ হল ব্যক্তিবিশেষ এবং বহুজনের সমষ্টিগত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। একক ও যৌথভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যপূরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষমতায়নের মার্গদর্শন এ পথে হেঁটেই।

বিশ্ব স্তরে, আমার ধারণা, 'মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল' বেশিরভাগ মানুষের কাছেই ভিনগ্রহের বিষয়বস্তু, যেভাবে এর রূপরেখা তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে মানুষের সামনে তা উপস্থাপিত করা হয়েছে—উভয় দিক থেকেই। উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশীদার হয়ে ওঠার লক্ষ্য পূরণের জন্য আমি মনে করি বিকাশের ভাষা—অন্য ধরনের ভাষা হওয়া উচিত। এ হল সমর্থের ভাষা, অসমর্থকে স্পর্শ করতে পারে না। দারিদ্র্য অসমর্থের একটি রূপভেদ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের কোনও ভূমিকা নেই এবং সম্পদ যাদের হাতের নাগালের বাইরে, দারিদ্র্য তেমন মানুষজনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণবিশেষ। দারিদ্র্যের এই ক্ষমতাহীন দশা কেবল কিছুটা পরিমাণ ঘোচানো যায় অংশগ্রহণ বা আলাপচারিতার যোগ দানের মধ্যে দিয়ে। জীবনের সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার ওপর আদপে এর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। যখনই ক্ষমতাহীনতার রূপভেদ হিসাবে দারিদ্র্যকে দেখা হয়, তার সমাধানকল্পে আমরা একে পন্থা হিসাবে দেখতে শুরু করি। ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে, বিশেষত মহিলাদের, যাতে তারা কাজকর্ম, জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শহরায়ন, উদ্বাস্তু (সমস্যা), শান্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। দেশ ও জাতির এই ধরনের ইস্তেহারে হারিয়ে যাওয়া শব্দটি হল 'লোকসমাজ' (Community) দেশের অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ এবং অর্থনীতি উভয়কেই অবশ্যই আমজনতার দাবি অনুযায়ী চালাতে হবে। তা না হলে উন্নয়ন এবং জীবিকাকে কখনোও মেলানো যাবে না, জীবনের দু'টি সমান্তরাল ও পরস্পরবিরোধী দিক হয়েই তা রয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আমার কিছু নিজস্ব বক্তব্য আছে। প্রথমত, যে কোনও ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল লক্ষ্যটা থাকে গরিব ঘরের মহিলাদের বিকাশ। বিশেষত, সেই সংস্কার যখন করা হয়—খাদ্য, জল, বস্ত্র, গৃহনির্মাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ব্যাংকিং পরিষেবার মতো—কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এমন মূল প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যে মোকাবিলার লক্ষ্য নিয়ে যে কোনও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হোক না কেন, 'কাজ'-টাকে মুখ্য বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। তৃতীয়ত, গরিব মানুষজনের সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে যা থেকে সংগত মাত্রায় সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থত, এক সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে গরিব খেটে খাওয়া মানুষজনকে তার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। এবং পঞ্চমত, মূল ধারার স্থানীয় তথা বিশ্ববাজারে বিকিকিনি শুরু করার জন্য তৃণমূল স্তরের স্বনিযুক্ত মহিলাদের সক্ষম করে তুলতে হবে।

আমার এই সওয়াল এক শিষ্ট অর্থনীতির জন্য। এখানে আমি বলতে চাইছি এমন এক অর্থনীতির কথা, যা প্রতিপালন করবে—ব্যক্তি বিশেষকে, সমাজকে এবং গোটা বিশ্বকে।

কিন্তু এটা করবে কে?

আমার অভিজ্ঞতায় এক জনগোষ্ঠীকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা থাকে মেয়েদের। মনোযোগটা যদি কেবল মহিলাদের ওপর সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহলেই চোখে পড়বে মানুষের এক বড়োসড়ো জোট, যাদের চাহিদা এক সুস্থির সমাজ। মেয়েরা নিজের পরিবারকে সবসময় থিতু দেখতে চায়। কর্মী, জোগানদার, তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষাদাত্রী, নেটওয়ার্কার—একই অঙ্গে মেয়েদের হরেক রূপ। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে যে কোনও ছাঁচে ঢালতে পারে—হয়ে ওঠে স্রষ্টা এবং সংরক্ষক। আমাদের শান্তি প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বকে আমি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করে থাকি। মহিলারা সমস্যার

গঠনমূলক, অভিনব এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান বের করতে পারেন। সর্বোপরি, মহিলারা যদি মুখ্য ভূমিকা নেন, তাদের উৎপাদনশীল কাজকর্ম সমাজকে ঠাসবুনোটে বেঁধে রাখতে সুতোর কাজটা করে। যখন হাতে উপযুক্ত কাজকর্ম থাকবে, এক সুস্থির সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখতে অপনার উৎসাহ থাকবে। আপনি না কেবল ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা করবেন, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনাও করবেন। আপনি নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে বিত্তসম্পত্তি তৈরির দিকে নজর দিতে পারেন; পরবর্তী প্রজন্মের উপর বিনিয়োগের করতে পারেন। জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বেঁচেবর্তে থাকা নয়, উন্নততর ভবিষ্যত্যের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বিষয়ও বটে। কাজকর্মের মাধ্যমে মানুষ তার শিকড় খুঁজে থিতু হতে পারে বলেই শান্তির বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এক সুস্থিত সমাজজীবন গড়ে ওঠে। এভাবেই একজন মানুষের জীবন অর্থবহ এবং সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, জীবনে আমি সর্বাধিক জোর দিয়ে থাকি নিজের কাজকর্মের উপর। কাজ বলতে এখানে আমি কারখানার চাকরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্বল্প বেতনে ঘাম ঝরানো তথা অমর্যাদার সস্তা শ্রমের কথা বলছি না—যা মানুষকে কারখানা ম্যানেজারের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এও এক ধরনের শোষণ বৈ অন্য কিছু নয়। কাজ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এমন সব কর্মকাণ্ড, যার মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন, (পানীয়) জলের বন্দোবস্ত হয়। এর অর্থ, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে যেসব ঐতিহ্যগত দক্ষতার চলন রয়েছে তথা বর্তমানের অর্জিত দক্ষতার মানোন্নয়ন। কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্যচাষ, গৃহনির্মাণ, বস্ত্র এবং বয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতার কথাই বলা হচ্ছে এখানে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড মানুষের খাওয়া পরার সংস্থান করে। ব্যক্তিবিশেষের নিজের সঙ্গে, আশেপাশের মানুষজনের সঙ্গে, এই পৃথিবী ও তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এবং সর্বোপরি সেই মহান আত্মা, যিনি আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সঙ্গেও এভাবেই নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কখনও আদৌ নজর দেওয়া হয়নি এমন সম্পদসমূহের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুঁজে দেখাটাই আজকের দিনে আমাদের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কীভাবে কাঠ কেটে অরণ্য সাফ করার পরিবর্তে বনসৃজনকে বেশি লাভজনক করে তোলা যায়; কীভাবে নতুন উৎপাদনের পরিবর্তে রিসাইক্লিংকে বেশি লাভজনক করে তোলা যায়—তার পন্থাপদ্ধতি আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের পাশাপাশি সামুদায়িক মালিকানাধীন পরিসম্পদের সৃষ্টির জন্য, উৎসাহ জোগাতে হবে। কেবল একটা ন্যায্য সুযোগ করে দিতে হবে, তাহলেই সহযোগিতার মধ্যে নিহিত শক্তির দৌলতে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমরা লাভের মুখ দেখতে সক্ষম হয়ে উঠব। আমাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি শব্দভাণ্ডারেও রদবদল ঘটানোর দরকার আছে। আমার মনে হয়, প্রভূত বিত্তশালী জাতীয় ব্যাংক হিসাবে নয়, বরং দেশের হাজার হাজার ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির জেলা স্তরের ব্যাংক হিসাবে SEWA (ব্যাংক) তার নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য অর্জনে অনেক অনেক বেশি সফল হয়ে উঠবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, মহিলারা নিজের ক্ষমতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জায়গা করে নিচ্ছে। কাউকে ব্রাত্য করে রাখা নয়, প্রত্যেককে সামিল করা যাবে, এমন এক সমাজ, এক সুস্থির পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে মহিলাদের এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কাজেই মেয়েদের নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে।

এযাবৎকালীন মেয়েদের কেবল যখন দরকার তখনই পাওয়া যায়, এমন এক সস্তায় লভ্য সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে আসা হচ্ছিল। কিন্তু, না, মেয়েরা গোটা বিশ্বের সম্পদ—তা উপলব্ধি করার উপযুক্ত হতে হবে দুনিয়াকে। চিরকাল সুসময়ে এবং দুঃসময়ে ঘাত-প্রতিঘাত সহন করতে থাকবে মেয়েরা—এ আর চলতে দেওয়া যায় না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হিসাবে অনেক তো দিন কাটানো গেল, এবার থেকে মেয়েদের অংশীদারের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। মেয়েদের এই যাত্রা পথে, লক্ষ্য তো আছেই, সঙ্গে জড়িত আছে মূল্যবোধও। এ পথে হাঁটার সময় প্রতি পদে সামনে নতুন নতুন বাঁক আসবে এবং এভাবেই শেখার কাজটা চলতেই থাকবে। এই প্রক্রিয়াটিই হল ক্ষমতা অর্জনের স্বরূপ। সময় সম্পর্কে মেয়েদের ধ্যানধারণা ভিন্নতর, সুতরাং, এ কাজ সম্পন্ন করতে যতটা সময় দরকার, তা লাগুক। দশ লক্ষের মতো মানুষের কাছে পৌঁছাতে SEWA-র সময় লেগেছে তিরিশ বছর। মেয়ের দৃষ্টি লোকসমাজের সমস্ত শ্রেণির প্রতি, তারা এদের সবাইকে সামিল করতে সচেষ্ট, অপেক্ষা করতে চায় তাদের জন্য, যারা পেছনে রয়ে গেছেন। এজন্য যদি কর্তব্যকর্ম শেষ করতে কিছুটা দেরিও হয়ে যায়—অসুবিধা নেই। নারী সমাজের লক্ষ্য হবে : আধিপত্য বিস্তার নয়, সামিল করা; অন্তিম লক্ষ্য অর্জন নয় (কর্ম) প্রক্রিয়া নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া; ব্যক্তিবিশেষের ওপর সমষ্টির স্বার্থকে স্থান দেওয়া; ভাগ ভাগ করে নয় সংহত রূপে দেখা। SEWA-র বোনেদের কাছ থেকে ধীর্ঘ অভিজ্ঞতার দৌলতে যা শিখে উঠতে পেরেছি এযাবৎ তাই তুলে ধরলাম এখানে।

আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা

আজকের দুনিয়ার চাহিদা আরও বেশি সংখ্যক মহিলা নেতৃত্ব। কারণ, আমাদের সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের দৌলতে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজটির মুখোমুখি হয়েছি আমরা। কেবল সংখ্যায় আরও বেশি মহিলারা নেতৃত্বদানে উঠে আসবেন, এই ধরনের কট্টর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাঞ্ছনীয় নয়। বরং পুরুষদের কাছ থেকেও নিজগুণে অনায়াস সম্ভ্রম আদায় করতে সক্ষম—সেই ধরনের নারীশক্তির নেতৃত্বে উঠে আসার কথা বলা হচ্ছে এখানে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক আমেদাবাদের SEWA(Self Employed Women's Association)-র প্রতিষ্ঠাতা। ইমেল : bhattela@sewa.org)

কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি

*প্রতিকূল নারী-পুরুষ অনুপাতের সমস্যা আমাদের দেশে আজকের নয়। গত শতকে আটের দশকের পর নিদারুণ এক খবরে শিউরে ওঠে দেশের লোক। জানা গেল বড়ো বড়ো শহরে চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্তির অপপ্রয়োগে জড়িত চিকিৎসকদেরই একাংশ। মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গর্ভপাত মেয়েদের জন্য সত্যিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মানুষ কেন ছেলে না মেয়ে, এভাবে লিঙ্গ বাছাই করে! সাধারণ মত হল, মানসিক গড়ন এজন্য দায়ি। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ হার বিস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সমাপতন বা মিল আছে কন্যাশিশুর অনুপাত কমে যাবার সময়কালের। অর্থনীতির ব্যাপক বাড়বাড়ন্ত এবং ভোলবদল সত্ত্বেও, নির্মম সত্যিটা হল এই বিকাশ হয়েছে খুব অসম। সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে মেয়েদের। এক ছেলে ও এক মেয়ে—একথার আসল মানে একটি ছেলে। তারপর এক মেয়ে হলে ঠিক আছে। কন্যাশিশুর অনুপাত বাড়াতে সরকারি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এই নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***মেরি ই জন***

প্রতিকূল নারী-পুরুষ অনুপাত-এর বিষয়টি আমাদের দেশে আজকের সমস্যা নয়। পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত কম থাকার সমস্যা চলে আসছে নিদেনপক্ষে ইংরেজ শাসনকাল থেকে। এক বড়ো সমস্যা হিসেবে ফের তা মাথাচাড়া দেয় বিশ শতকের সাতের দশকে। রাজপুত ও জাঠদের মধ্যে ঘরের কন্যাসন্তান মেরে ফেলার প্রবণতার কারণ খুঁজতে উনিশ শতকে তত্ত্বতালাশ চালিয়েছে ইংরেজ প্রশাসন। স্বাধীনতার পরও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলার হেতু সম্পর্কে হাতড়ে বেড়িয়েছেন জনতত্ত্ববিদরা। এই ইস্যুটির মোকাবিলা বা সমাধানের বিষয়ে আকছার মতভেদ বা বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছে আগাগোড়া। উনিশ শতকের আটের দশকের পর এক নিদারুণ খবরে শিউরে ওঠে সবাই। জানা গেল, দিল্লি, অমৃতসর, ও বোম্বাই-এর মতো বড়ো বড়ো শহরে অকাতরে চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠার পর্যায়গুলির নজরদারির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সংস্থান আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। সেই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনেক ক্লিনিকে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা হয় অবৈধভাবে। কন্যাভ্রূণ হলে অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভপাত ঘটানো হয়।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্তির অপপ্রয়োগে জড়িত চিকিৎসকদেরই একাংশ। আইনের (প্রি-কনসেপশান অ্যান্ড প্রি-নেটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিকস অ্যাক্ট) মাধ্যমে ভারতে এই পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের চোখে এ এক মারাত্মক অপরাধ। দোষী চিকিৎসক ও রেডিওলজিস্টদের ধরপাকড় করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বন্ধের জন্য চলে জোরদার তৎপরতা। একাজে সফল হতে কসরত করতে হয়েছে দস্তুরমতো। ক্লিনিক, চিকিৎসকমহল ও রাজ্যস্তরের নজরদারি সংস্থাগুলির অশুভ আঁতাত এই প্রচেষ্টা ভেস্তে দিতে কম কসুর করেনি।

"অভিধানের ভাষায়, মানসিক গড়ন বলতে বোঝায় 'প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কারও আস্থা, অটুট বিশ্বাস।' দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিধান উল্লেখ করেছে 'মনে হয় অঞ্চলটি মধ্যযুগের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে।' কন্যা না পুত্র—এভাবে লিঙ্গ নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে ধারণা ও তার বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে, আমার মনে হয় এই সংজ্ঞা এবং উদাহরণ খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ে জড়িত ডাক্তারদের মুখোশ খুলে দেওয়া ও এই পরীক্ষা অবৈধ তথা অপরাধমূলক বলে আইন জারির জন্য প্রশাসনের তরফে জোরদার তৎপরতার দরকার ছিল। খুব কম সংখ্যক সরকারি কর্মী ও জেলাশাসকের মধ্যে (ব্যতিক্রম হিসাবে ফরিদাবাদ ও হায়দরাবাদ-এর উল্লেখ করা যায়) সেই তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের বীড জেলায় কিছু অ-সরকারি সংস্থা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ তথা হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের মুখোশ খুলে দিতে এগিয়ে আসে। কেউ কেউ অবশ্য সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই তৎপরতার কারণে সার্বিকভাবে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যা আদৌ কাঙ্খিত নয়। ভারতে মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার কখনই পুরোপুরি তাদের

নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। বরং আমাদের পরিবার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভ্রূণ হত্যাবিরোধী তৎপরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতের সুযোগ মেলা মহিলাদের পক্ষে আরও শক্ত হয়ে ওঠার আশংকা ছিল। মনে রাখতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের গর্ভপাত করাটা নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

মানসিকতার বিষয়টি ফের ভেবে দেখা

মানুষ কেন ছেলে না মেয়ে, এভাবে লিঙ্গ ভেদাভেদ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে? সাধারণ মত হল, মানসিক গঠন বা দৃষ্টিভঙ্গি এজন্য দায়ি। সমস্যার মূল কারণ, মানুষের মানসিক গড়ন ও সেজন্য চাই তার বদল—একথা আমরা শুনে থাকি হামেশাই। এই পরিভাষার আদত অর্থটা ঠিক কী? অভিধানের ভাষায়, মানসিক গড়ন বলতে বোঝায় 'প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কারও আস্থা, অটুট বিশ্বাস।' দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিধান উল্লেখ করেছে 'মনে হয় অঞ্চলটি মধ্যযুগের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে।' কন্যা না পুত্র—এভাবে লিঙ্গ নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে ধারণা ও তার বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে, আমার মনে হয় এই সংজ্ঞা এবং উদাহরণ খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রথা মেনে চলার জন্য দোষি পরিবারগুলি পুত্র ও কন্যা নিয়ে অনড় ধারণায় ভুগছে। তাদের মতামত কন্যাদের অবমূল্যায়নকারী সাবেকি ধ্যানধারণায় আটকে। এর আর একটা মানে, তাদের মানসিক গড়ন বদলানো উচিত—একথা বলার সময় আমরা চাই, সাবেকিয়ানা কিঞ্চিৎ ঝেড়ে ফেলে তারা একটু আধুনিক মনের হয়ে উঠুক। কন্যাশিশুর প্রতিকূল অনুপাত নিয়ে আমাদের গবেষণার ভিত্তিতে, আমি মনে করি যে সমস্যাটি বোঝার ব্যাপারে খামতি আছে ঢের। এভাবে চিন্তা করার সময়, আমরা ধরে নিই, এসব মানুষদের চিন্তাভাবনা সমকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কন্যা নয়, পুত্র—এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় আজকাল পরিবারগুলি কী ভাবে, তা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। বস্তাপচা ধ্যানধারণা নয়, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে কী ধরনের সম্পদ জোগাড় করতে সক্ষম হবে, সেই প্রত্যাশার উপর ভর দিয়ে পরিবারগুলি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করে। সুতরাং, হ্যাঁ, একথা ঠিক যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নিয়েই আমাদের কারবার। কিন্তু এসব চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিবারগুলি এখন শিশুর জন্মদান ও তাদের মানুষ করে তোলার সঙ্গতি নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছে। এ এক খুব গতিশীল ও জটিল সম্পর্ক। এক্ষেত্রে হালের পরিবেশ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ফেলে পরিবারগুলির উপর (বিশদ জানার জন্য দেখা যেতে পারে জন ও অন্যান্যের ২০০৮; ইউ এন উইমেন ২০১৫)।

"কিছুটা সচ্ছল (হতদরিদ্র নয়) পরিবার তাদের আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা কম রেখে। তারা, এক আধটা ছেলেপুলে হলে, তাদের জন্য বিনিয়োগ' করতে পারে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাই-এর চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে তারা চায় এক ছেলে ও এক মেয়ে। একথার আসল মানে, নিদেনপক্ষে একটি ছেলে। তারপর একটা মেয়ে হলেও ঠিক আছে। এসব পরিবার বেশ 'আধুনিক'। কেননা, তারা চায় সন্তান থাক যথেষ্ট যত্নআত্তি, পুষ্টি, ভালো শিক্ষাদীক্ষার বাতাবরণে। বড়ো হলে সন্তান যেন সফল জীবনে থিতু হয়—ছেলের জন্য ভালো কাজ, চাকরি এবং মেয়ের সুখী বিবাহিত জীবন। ভাবাটা সহজ কিন্তু করে ওঠা বড়ো ঝকমারি।"

এর আরও মানে দাঁড়ায়, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, উনিশ শতকে আটের দশক অবধি পাওয়া প্রযুক্তিগুলি ছাড়াও, গত কয়েকটি দশকের অন্য কোন ধরনের অগ্রগতি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে? কোন ধরনের পরিবার বিশেষ করে প্রভাবিত?

সবার আগে লক্ষণীয় যে, ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ হার বিস্তর বাড়ার সঙ্গে সমাপতন বা মিল আছে কন্যাশিশুর অনুপাত কমে যাবার সময়কালের। অর্থনীতির ব্যাপক বাড়বাড়ন্ত এবং ভোলবদল সত্ত্বেও, নির্মম সত্যিটা হল, এই বিকাশ হয়েছে খুব অসম এবং একটু বেশি বয়সীদের জন্য যথেষ্ট নতুন কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে মেয়েদের। কিছুটা সচ্ছল (হতদরিদ্র নয়) পরিবার তাদের আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা কম রেখে। তারা, এক আধটা ছেলেপুলে হলে, তাদের জন্য বিনিয়োগ' করতে পারে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাই-এর চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে তারা চায় এক ছেলে ও এক মেয়ে। একথার আসল মানে, নিদেনপক্ষে একটি ছেলে। তারপর একটা মেয়ে হলেও ঠিক আছে। এসব পরিবার বেশ 'আধুনিক'। কেননা, তারা চায় সন্তান থাক যথেষ্ট যত্নআত্তি, পুষ্টি, ভালো শিক্ষাদীক্ষার বাতাবরণে। বড়ো হলে সন্তান যেন সফল জীবনে থিতু হয়—ছেলের জন্য ভালো কাজ, চাকরি এবং মেয়ের সুখী বিবাহিত জীবন। ভাবাটা সহজ কিন্তু করে ওঠা বড়ো ঝকমারি। অনিশ্চয়তায় ভরপুর এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, বিশেষত কন্যাকে মানুষ করাটা তাদের কাছে গুরুভার ও উদ্বেগের বলে মনে হচ্ছে। এতসব ঝুটঝামেলা এড়াতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবারগুলির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে। তারা চাইছে না কন্যার জন্ম।

সরকারি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পরিবারগুলির কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে সরকার রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের কর্মসূচির মতো তার হাতের যাবতীয় উপায় অবশ্যই

কাজে লাগাবে। আগেই বলা হয়েছে, এসব পরিবার কিছুটা সচ্ছল। তারা আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা সীমিত রেখে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাইয়ের চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের লক্ষ্য 'নিখুঁত' পরিবার—এক ছেলে এক মেয়ে। ২০১১-র জনগণনায় ধরা পড়েছে, বেশ কিছু রাজ্যে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সী কন্যাশিশুর অনুপাত কমে গেছে অনেকখানি। কন্যাশিশুর তথাকথিত কম উপযোগিতার ধারণা বদলাতে, বিশেষ করে রাজ্যস্তরে চালু হয়েছে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি। ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে কিছু চলতি প্রকল্প। বাল্য বিবাহ ঠেকানো, গরিব বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাবার জন্য উৎসাহ দেওয়া, আঠারো বছর বয়সের আগে তাদের বিয়ে না দেবার জন্য 'আপনি বেটি আপনি ধন'-এর মতো আছে অনেক সরকারি প্রকল্প। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে শর্তাধীন নগদ টাকা হস্তান্তরের প্রকল্প চলছে। নাম থেকেই বোঝা যায়, লাডলি ও ধনলক্ষ্মী-র মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কন্যার জন্মের জন্য পরিবারকে উৎসাহ জোগাতে। কন্যার জন্ম, রোগ প্রতিষেধক (ইমুনাইজেশন), স্কুলে পড়াশুনোর কালে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে। আঠারো বছর বয়স হলে এবং তখনও বিয়ে না করলে মিলবে থোক টাকা। এসব প্রকল্পের ধ্যানধারণার পিছনে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যার 'বোঝা' টাকায় পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এসব প্রকল্প অবশ্য শর্তে বোঝাই। ফলে প্রকল্পগুলির কাজকর্ম হোঁচট খাচ্ছে। প্রকল্পগুলি নিয়ে চর্চা চালিয়েছে ওয়াশিংটনের ইনটারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইমেন। কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পে যোগ না দেওয়া শিশুদের তুলনায় উপকৃত পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে টিকে থাকা একটু বেড়েছে। কিছু সমীক্ষা বলছে, হরেক শর্ত জড়িত থাকাটা মস্ত বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, গরিবি রেখার নিচের পরিবারগুলিকে (বি পি এল) টার্গেট করাটা। এর অর্থ, একেবারে গরিব নয়, একটু সচ্ছল পরিবারের কাছে এসব প্রকল্পের সুযোগ অধরা। এসব পরিবারেই কিন্তু ছেলে না মেয়ে, বাছাই করার ঝোঁক বেশি। অনেকে আবার সমালোচনায় মুখর যে এসব প্রকল্পের ফলে পরিবারের পক্ষে কন্যা এক বোঝাস্বরূপ, মানুষের এই ধারণা আরও জোরদার হচ্ছে।

দু' বছর আগে বিস্তর প্রচার চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচি। বরাদ্দ হয় ১০০ কোটি টাকা। হরিয়ানার মতো রাজ্যের কয়েকটি জেলায় কন্যাশিশুর অনুপাত বহুদিন যাবৎ বেশ কম। এই প্রকল্প নিয়ে প্রচারে কোনও ঘাটতি ছিল না। শহরের পর শহর, ও প্রধানসড়ক জুড়ে ঢাউস সব হোর্ডিং। বাসের পিছনে বিজ্ঞাপন। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ঘোষণা। শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও, এই কর্মসূচি কিন্তু শর্তসাপেক্ষ নগদ হস্তান্তর প্রকল্পগুলির মতোই ধাক্কা খেয়েছে। কেননা, সব টাকা ঢালা হচ্ছে প্রচার অভিযানের জন্য। লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষায় যুক্ত লোকজন বা মেয়েদের পড়াশুনোয় তেমন একটা আগ্রহী নয়, এমন পরিবারের 'মানসিক গঠনই' যেন একমাত্র দায়ি। শুধুমাত্র জোরদার প্রচার চালিয়ে তা শুধরে নেওয়ার সম্ভাবনা কম। এই নিবন্ধে আগেই সওয়াল করা হয়েছে, প্রথমত মানুষ গতানুগতিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুগছে না। পরিস্থিতি সঙ্গিন হবার কারণ, শিক্ষার অধিকার রূপায়ণে প্রধান ভরসা সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস) এবং সর্বশিক্ষা অভিযান-এর মতো বড়োসড়ো সরকারি কর্মসূচিতে গত দু' বছর বাজেট বরাদ্দে কাটছাঁট। পুষ্টি, নবজাতক ও শিশুর পরিচর্যা, সবার জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। কন্যা সমেত সকল শিশুর জীবনের মান উন্নত করতে এগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ বাছাই সমস্যার বিস্তার রোখায় আরও বেশি অগ্রগতি চাইলে, রাজ্যের অভিযান এবং বিশেষত নীতিগুলিকে তাদের কর্মকান্ডের ফল সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। প্রথম কথা, মানসিক গড়ন বদলানোর ঊর্ধ্বে উঠে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য দায়ি সমাজের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন করা। একেবারে গোড়ার পর্যায়ে এর অর্থ, এমন এক উন্নয়নের পদ্ধতি যা কিনা মা-বাবাকে তাদের ছেলে ও মেয়ের সম্বন্ধে এত স্বতন্ত্রভাবে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন কমিয়ে দেয়—যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। মেয়েদের যৌন নিরাপত্তা নিয়ে মা-বাবার ক্রমবর্ধিত ভয়ভীতিও কাটানো দরকার। পরিবারের মদত ছাড়াই নিজেদের জন্য তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়েপিটে নিতে পারে—আজকের যুব সম্প্রদায়ের দরকার এই আপ্তবাক্যে আস্থা রাখা।❑

"প্রথম কথা, মানসিক গড়ন বদলানোর ঊর্ধ্বে উঠে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য দায়ি সমাজের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন করা। একেবারে গোড়ার পর্যায়ে এর অর্থ, এমন এক উন্নয়নের পদ্ধতি যা কিনা মা-বাবাকে তাদের ছেলে ও মেয়ের সম্বন্ধে এত স্বতন্ত্রভাবে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন কমিয়ে দেয়—যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। মেয়েদের যৌন নিরাপত্তা নিয়ে মা-বাবার ক্রমবর্ধিত ভয়ভীতিও কাটানো দরকার।"

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক সেন্টার ফর উইমেনস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর সিনিয়র ফেলো। তিনি সেন্টার ফর উইমেনস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর প্রাক্তন অধিকর্তা এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেনস স্টাডিজ প্রোগ্রামের সহযোগী অধ্যাপক ও উপ অধিকর্তা।
ইমেল : maryejohn1@gmail.com)

WBCS -2015 Gr. C/D INTERVIEW

সাফল্য আসুক এবারেই

সাফল্য তার দিকেই ধেয়ে আসে যে সাফল্যের জন্য ঝাঁপায়। ইন্টারভিউ হল এক উভয়মুখী প্রক্রিয়া; যেখানে একজন প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক গঠন যাচাই করা হয়, এই যাচাইয়ের কাজটা হয় অত্যন্ত সূদক্ষভাবে, বলা যায় এক্স-রে মেশিনের সাহায্যে। প্রিলি এবং মেন পরীক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গভীরতা মাপা হয়ে গেছে কিন্তু এতে প্রমাণ হয়নি রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলির জন্য তুমি যোগ্য কিনা। ইন্টারভিউয়ে সফল হয়ে প্রার্থী রাজ্যের প্রশাসক হবে, না কি ব্যর্থের দলে নাম লেখাবে তা নির্নয় করে ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউতে কোন পরীক্ষার্থী ২০০ এর মধ্যে ১৬০ -১৭০ পাচ্ছে, আবার কেউ পাচ্ছে শুধুমাত্র ৩০-৪০। তাই শুধুমাত্র সাফল্য নয়, উপরের দিকে র‍্যাঙ্ক করে নিজের প্রথম পছন্দের চাকরিটি পাওয়ার জন্য ইন্টারভিউ হল অন্যতম হাতিয়ার। কেউ যদি ACTO বা Jt BDO হতে চায় তবে অবশ্যই ইন্টারভিউকে গুরুত্ব দিতে হবে। ইন্টারভিউ ১৫-২০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না। এই অল্প সময়ে কারও ক্ষমতা-দক্ষতা যাচাই করা বেশ কঠিন কাজ। ফলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তোমাকেই উদ্যোগ নিতে হবে, এমন কিছু পদক্ষেপ করতে হবে যা ইন্টারভিউয়ারদের চমৎকৃত করতে পারে। এর জন্য তোমাকে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে, নিজের

'ইন্টারভিউ হল লুডোর ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। গেটকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু — তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।'

উত্তর যেন সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থ হয় সবসময় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। ইন্টারভিউ কক্ষে জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা মাপা হয় না। **প্রশ্নের উত্তরে তুমি কী বলছ সেটা বিবেচ্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল তুমি উত্তরটা কীভাবে দিচ্ছো।** তোমার পড়াশোনার বিষয়কে কার্যক্ষেত্রে তুমি কীভাবে প্রয়োগ করছো কিংবা পাঠ্যাংশের জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে কীভাবে মেলবন্ধন করছো সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়।

ইন্টারভিউয়ে প্রমাণ করতে হবে সিভিল সার্ভিসের জন্য তুমি যোগ্য। এই পরীক্ষায় প্রার্থীর কেবলমাত্র বিচারবোধ বা ধীশক্তির বিচার করা হয় না। পাশাপাশি দেখা হয় প্রার্থীর ব্যক্তিত্বে এবং কর্ম পন্থায় সামাজিক-চারিত্রিক গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছে কিনা। এর সঙ্গে দেখা হয় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রার্থী কতটা ওয়াকিবহাল এবং কতটা একাত্ম। প্রিলি ও মেন পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার মান ও গভীরতার স্বাক্ষর রেখেছে ওই দুই পর্বে। তবে ইন্টারভিউ কেন? প্রশ্নটা সঙ্গত। আর উত্তরটা জানা থাকলে ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করা যায়। ইন্টারভিউ হল প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের পরীক্ষা। অতি অল্প সময়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে? উত্তরে বলা যায়, ইন্টারভিউয়ের একটি Concept of Law থাকে, প্রার্থীকে সেই সব Concept এর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ইন্টারভিউয়ের সেই সব ধারণা গুলিকে সহজ, প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে পরিস্ফুট করতে হবে। আর সে জন্যই দরকার একজন দক্ষ এবং ডেডিকেটেড গাইডের। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে যে অদ্বিতীয় তা এখানকার সাফল্যেই প্রমানিত। এবারেই সাফল্য নিশ্চিত করতে চাইলে তোমার গন্তব্য হওয়া উচিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

প্রিলিম -২০১৭ মক টেস্ট

আপনি কি ডব্লুবিসিএস ২০১৭ প্রিলি পরীক্ষায় বসছেন? আপনার প্রস্তুতি সঠিক পথে চলছে কিনা তা জেনে নেওয়া একান্তই জরুরি। বারবার মকটেস্ট দিয়ে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন, আর নিজের নেট স্কোরকে রাখুন কাট অফের ওপরে। একমাত্র আমাদেরই সুপরিকল্পিত এবং স্ট্যান্ডার্ড মকটেস্টগুলি পারে এ বছর আপনার প্রিলির বাধাকে অতিক্রম করাতে। মকটেস্টের প্যাকেজে থাকছে—

■ ১৫টি ২০০ নম্বরের মক টেস্ট। ■কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস।
■ সাফল্যের টিপস। ■৫০ টিরও বেশি ক্লাস টেস্ট।

WBCS-2017 প্রিলির শেষ ব্যাচে ভর্তি চলছে।

প্রকাশিত হল সামিম সরকারের সম্পাদনায়
WBCS SCANNER
ফোন : 7031842001

সামিম সরকারের বহু প্রতীক্ষিত 'ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার' খুব শীঘ্রই প্রকাশ হতে চলেছে।

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata - 700073
© 9674478644
© 9038786000

Centre : Uluberia-9051392240 ●Barasat-9800946498 ●Berhampur-9474582569 ●Birati-9674447451
●Darjeeling-9832041123 ●Midnapur-9474736230 ● Siliguri -9474764635 ■Website : www.academicassociation.in
ফোন করুন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।

নারীর ক্ষমতায়ন : সমকালীন তথ্যের আলোকে পর্যবেক্ষণ

নারীর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটা কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে নারীদেরই লড়তে হয়েছে, লড়তে হয়েছে প্রবল এক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং এই লড়াই-এর ইতিহাস সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই তার নিজস্ব আঙ্গিকে প্রতীয়মান। নারীর ক্ষমতায়নের কাজটির আগে দরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস ব্যাপ্তিতে এবং বৈচিত্র্যে এতই বিশাল যে, সামান্য দু'-এক পৃষ্ঠায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আধুনিক পৃথিবীতে আজ, এ সম্পর্কে নিরন্তর গবেষণা চলছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাই খুবই সীমাবদ্ধ, ভারতবর্ষে স্বাধীনোত্তর যুগে বা আরও সঠিকভাবে বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের পরবর্তী সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি ব্যবস্থায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি।

লিখেছেন—**ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য**

"আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা—তবে আমার মানব জন্ম কেন বঞ্চিত করা"—এই আর্তি যুগে যুগে, দেশে দেশে মহিলাদের অন্তরের উপলব্ধির হার্দিক প্রকাশ। নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের লড়াই-এর ইতিহাস দু'শো বছরেরও বেশি পুরোনো এবং নারীবাদী আন্দোলনের মাইলফলককে যদি মেরি উলস্টোনক্র্যাফ্টের বিখ্যাত বইয়ের প্রকাশকাল (১৭৯২ সন) ধরা হয়, তবে বিগত দু'শো বছরে, দেশে দেশে, কালে কালে নারীকে নিজের অধিকার অর্জন ও রক্ষার জন্য সমাজ, আইন, প্রশাসন—সর্বস্তরেই ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে এবং সেই সংগ্রাম আজও চলছে, হয় তো তার আঙ্গিক পৃথকতর। আমাদের দেশেও দেখা গেছে যে বহু শত যুগ আগে জনক রাজার সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহিয়সী গার্গীর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে গার্গীর মেধাকে সম্মান করেননি, বরঞ্চ পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ মহর্ষি গার্গীকে বললেন—"থামো"। তারপর তো গঙ্গা, গোদাবরী, শতদ্রু দিয়ে কত জল বয়ে গেছে, কিন্তু মহিলাদের প্রতি সমাজ-সংসারের বঞ্চনা কিছুমাত্র কমেনি, নানাভাবে ও নানা উপায়ে নারীর মানবজন্ম বঞ্চিত করার নিত্যনতুন পন্থা ক্রিয়াশীল থেকেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন অ্যানি বেসান্ত (বিখ্যাত হোম রুল আন্দোলনের প্রবক্তা) এবং পরবর্তীতে সরোজিনী নাইডু। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের যুক্ত করতে না পারলে তা পূর্ণতা পাবে না এবং সে কারণে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলেছিলেন। ১৯১৬ সালে দক্ষিণ মুম্বাইতে ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—"শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হয়, যা দেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অন্য উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলি হল সরলাদেবী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল (১৯১০), ভারত মহিলা সংগঠন (১৯১৭), ভারতীয় মহিলা জাতীয় পরিষদ (১৯২৫), মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ট্রাস্ট (১৯৪৫) ইত্যাদি।

তবে একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভলো যে, নারীর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটা কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে নারীদেরই লড়তে হয়েছে, লড়তে হয়েছে প্রবল এক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং এই লড়াই-এর ইতিহাস সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই তার নিজস্ব আঙ্গিকে প্রতীয়মান। নারীর ক্ষমতায়নের কাজটির আগে দরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস ব্যাপ্তিতে এবং বৈচিত্র্যে এতই বিশাল যে, সামান্য দু'-এক পৃষ্ঠায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আধুনিক পৃথিবীতে আজ, এ সম্পর্কে নিরন্তর গবেষণা চলছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাই খুবই সীমাবদ্ধ, ভারতবর্ষে স্বাধীনোত্তর যুগে বা আরও সঠিকভাবে বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের পরবর্তী সময়কাল থেকে (সাতের দশকটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, যে ১৯৭৫ সালকে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক নারী বৎসর হিসেবে ঘোষণা করে) আজ পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি ব্যবস্থায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরির প্রচেষ্টা মাত্র। আরও বলে রাখা ভালো যে, প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অবকাশ এখানে পাওয়া যায়নি, যদিও এই বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ সরকারি ও অ-সরকারি স্তরে যথেষ্টই হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

বিগত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্ব মহিলা সম্মেলন মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১৩৩-টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনে আগামী দশ বছরে মহিলাদের উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার রূপরেখা স্থির করা হয়। পরবর্তীতে কোপেনহেগেন (১৯৮০), নাইরোবি (১৯৮৫) এবং বেজিং-এ (১৯৯৫) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নে বেজিং সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সম্মেলনে ঘোষিত কার্যবিবরণী এবং করণীয় কর্তব্যগুলি বিশ্বের ১৮৯-টি দেশ নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে তথা সেগুলি রূপায়ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ও সমানাধিকারের প্রশ্নে সেই সম্মেলনে ১২-টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়; যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, হিংসা রোধ ইত্যাদি অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৫ সালের পর থেকে রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা করে থাকে এবং করণীয় কর্তব্যগুলি স্থির করে।

ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ বিগত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়া থেকেই নেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে মুম্বাই-এর SNDT মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীবিদ্যা বিষয়ক এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনের ফলস্বরূপ ১৯৮২ সালে ভারতীয় মানবীবিদ্যা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মানবীবিদ্যা বিষয়ক পড়াশুনো এবং এই বিষয়ে গবেষণার কাজে এই সংগঠন আত্মনিয়োগ করে।

১৯৮৫ সালে ভারত সরকার মহিলা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে একটি পৃথক "মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ" গঠন করে এবং পরবর্তীতে, ৩০.০১.২০০৬ থেকে বিভাগটিকে পূর্ণ মন্ত্রকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নামেই প্রতীয়মান যে মন্ত্রকটি দেশের নারী ও শিশু উন্নয়নের নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত।

"১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পৃথিবীর বহু দেশে জেন্ডার বাজেটের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর অনুশীলন শুরু হয়। ভারতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন কিছু কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার রূপায়ণের মাধ্যমে মহিলারাই কেবলমাত্র উপকৃত হতে পারেন। ২০০৪-'০৫ সাল থেকে ভারত সরকারের প্রতিটি মন্ত্রক ও দপ্তরে "জেন্ডার বাজেট সেল" গঠন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ২০০৭ সালে অর্থমন্ত্রক জেন্ডার বাজেট সেলের জন্য এক সনদ প্রস্তুত করে, যেখানে উক্ত সেলের গঠন ও কার্যাবলী পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ মিলিয়ে বর্তমানে জেন্ডার বাজেটের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।"

১৯৯২ সালে গঠিত মহিলা জাতীয় কমিশন গঠন এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হয়। এই বিধিবদ্ধ সংস্থাটি যে যে বিষয়গুলি নজর দেবে তার অন্যতম হল—

(ক) মহিলা সুরক্ষায় সাংবিধানিক ও আইনগত রক্ষাকবচ;

(খ) সংশ্লিষ্ট আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ;

(গ) বিভিন্ন অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ; এবং

(ঘ) মহিলাদের ওপর প্রভাব ফেলবে এমন যে কোনও নীতি গ্রহণ সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ দান।

রাষ্ট্রসংঘের ১৯৯৫ সালের বেজিং সম্মেলনের ফলস্বরূপ ভারতে ২০০১ সালে মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল মহিলাদের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন। ২০১৬ সালের মে মাসে ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে মহিলা জাতীয় নীতি, ২০১৬-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে; যা মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক নতুন দিশার সূচনা করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।

২০১০ সালে রাষ্ট্রসংঘ (মহিলা) প্রকাশিত এক নির্দেশিকায় ব্যবসা ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

(ক) নারী-পুরুষের সাম্য বজায় রাখতে উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব দান;

(খ) কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহায়তা ও শ্রদ্ধার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা, যাতে করে উভয়ের মধ্যে কোনওরকম বৈষম্য গড়ে না উঠতে পারে;

(গ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মচারির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও ভালো থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা;

(ঘ) মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর মহিলাদের সক্ষমতা উন্নয়ন পরিমাপ করা ও নারী-পুরুষ সাম্য-এ লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১০ সালে মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক জাতীয় মিশন শুরু করে, যার মূল লক্ষ্য হল মহিলাদের উন্নয়ন এবং

ক্ষমতায়নের কথা বিবেচনায় রেখে এমন এক সার্বিক পরিকাঠামো তৈরি করা যার মাধ্যমে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে যেন এক সমন্বয় গড়ে ওঠে, যাতে করে মহিলাদের উন্নয়ন তথা সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়।

নারী সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

আগেই বলা হয়েছে যে, বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের সময় থেকে ভারতে নারী সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দেশের সরকার বিবিধ প্রকল্প ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপগুলি গ্রহণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিভিন্ন সমাজে নারীদের বর্তমান স্টেটাস-এর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিভিন্ন নির্দেশিকার কথাও গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, ভারতে জেন্ডার বাজেটের প্রচলন গত শতাব্দীর নয়ের দশকের থেকে শুরু করা হয়, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উক্ত বাজেটের ফলপ্রসূ ভূমিকার বাস্তবসম্মত প্রতিফলনে ভাস্বর। অন্যদিকে সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে (যেমন, ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী) মহিলাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার বিষয়গুলিও নিশ্চিত করা হয়েছে.

সারণি-১-এ নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

জেন্ডার বাজেট

জেন্ডার বাজেট মহিলাদের সমগ্র জীবনচক্র জুড়ে চলা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তুত এক বাজেট, যার উদ্দেশ্য হল সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের অসাম্য দূর করতে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি, কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং উক্ত বাজেটের মাধ্যমে ওই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান।

সারণি-১
নারী ক্ষমতায়নের লক্ষে বিবিধ সরকারি প্রকল্প

সময়কাল	প্রকল্পের নাম	সূচনা বৎসর	মুখ্য বৈশিষ্ট্য
১৯৭৫-'৮৫	সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৭৫	(i) ৬ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের খাদ্য সরবরাহ, প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা; (ii) গর্ভবতী মহিলা ও সদ্যোজাত শিশুর মায়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ।
	গ্রামীণ নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮২	গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সন্তান প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান।
১৯৮৬-'৯৫	প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সহায়তা	১৯৮৬-'৮৭	১৬ বৎসরের উর্দ্ধে গ্রামীণ মহিলাকে স্ব-রোজগারী ও উদ্যোগপতি করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
	জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫	উক্ত মূল প্রকল্পের অন্তর্গত "জাতীয় মাতৃত্ব সুবিধা" উপ-প্রকল্পে সরকার প্রথম দু'টি সন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের পর মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও সুষম আহারের জন্য আর্থিক অনুদান দেবে।
	মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা	১৯৯৩	(i) গ্রামের মহিলাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা; (ii) ডাকঘরে সেভিংস খাতা খোলা হবে; (iii) বার্ষিক জমা টাকার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরান্তে বোনাস দেবে
	স্ত্রী-শক্তি পুরস্কার	১৯৯১	আর্থিক ও সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে যে সমস্ত মহিলা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন, তাদের উৎসাহদান ও স্বীকৃতি প্রদান।
১৯৮৬-'৯৫	রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ	১৯৯৩	মহিলা উদ্যোগপতিদের উৎসাহদান, নারী উন্নয়নে নিয়োজিত সংগঠনগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণাকার্যে মহিলাদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান।
১৯৯৬-২০০৫	প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা (পূর্বতন, ইন্দিরা আবাস যোজনা)	১৯৯৬	(i) গ্রামের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মহিলা-দের জন্য গৃহনির্মাণ; (ii) বাড়ির মালিকানা পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে হবে;
	স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা	১৯৯৯	(i) গ্রামে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর করা; (ii) স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা; (iii) গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা।
	স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্প	২০০২	(i) আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণ করার দিগ্‌নির্দেশ; (ii) গ্রাম সংসদের সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে উৎসাহদান।
	স্বাধার (স্ব-আধার) প্রকল্প	২০০২	(i) শৌর্য্য ও কর্মের দিক থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা; (ii) প্রতিকূল পরিবেশে যাতে মহিলারা নিজেরাই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়ন।
১৯৯৬-২০০৫	রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প (কর্মরত মায়েদের শিশুদের জন্য)	২০০২-'০৩	(i) ০-৬ বছরের শিশুর কর্মরত মায়ের কাজের সময়ে দেখাশোনা, সুষম আহার ও প্রয়োজনে ওষুধের ব্যবস্থা করা ও ক্রেশ-এর সুবিধাদান;

শেষাংশ পরের পাতায়...

জেন্ডার বাজেট এই দর্শন থেকে প্রণয়ন করা হয় যে, নারীকেন্দ্রিক প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে নারীদের যদি উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়, তাদের যদি প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলা যায়, তবে বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীসমাজ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষের সঙ্গে একযোগে ও একতালে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামিল হবে। বলাই বাহুল্য, এর মাধ্যমে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই উপকৃত হতে পারবে।

১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পৃথিবীর বহু দেশে জেন্ডার বাজেটের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর অনুশীলন শুরু হয়। ভারতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন কিছু কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার রূপায়ণের মাধ্যমে মহিলারাই কেবলমাত্র উপকৃত হতে পারেন। ২০০৪-'০৫ সাল থেকে ভারত সরকারের প্রতিটি মন্ত্রক ও দপ্তরে "জেন্ডার বাজেট সেল" গঠন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ২০০৭ সালে অর্থমন্ত্রক জেন্ডার বাজেট সেলের জন্য এক সনদ প্রস্তুত করে, যেখানে উক্ত সেলের গঠন ও কার্যাবলী পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ মিলিয়ে বর্তমানে জেন্ডার বাজেটের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এমনকি স্থানীয় সরকারও (যেমন, কেরালায় হয়েছে) তাদের নিজস্ব বাজেটে জেন্ডার বাজেটকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা এবং অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানও এই বাজেট সাফল্যের সঙ্গে প্রণয়ন করছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত প্রকল্প

দেশের অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেবার বিশেষ প্রচলন রয়েছে। এর দু'টি কারণ, এক, দারিদ্র্য এবং দুই, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব। এছাড়া সামাজিক ও পারিবারিক চাপ তো থাকেই। এর মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে এবং

...আগের পাতা থেকে...

সময়কাল	প্রকল্পের নাম	সূচনা বৎসর	মুখ্য বৈশিষ্ট্য
	জননী সুরক্ষা যোজনা	২০০৫	(i) গর্ভবতী মা এবং নবজাতক শিশুদের মৃত্যুহার কমানো; (ii) দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গর্ভবতী মহিলাকে প্রসবকালীন পরিকাঠামোর ব্যবস্থা ও গর্ভাবস্থায় ও তারপরে উপযুক্ত চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করা।
২০০৬-২০১৫	কিশোরী শক্তি যোজনা	২০০৬-'০৭	(i) ১১-১৮ বছর বয়সী কিশোরীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের ক্ষমতায়ন করা।
	উজ্জ্বলা প্রকল্প	২০০৭	(i) নারী ও শিশু পাচার রোধ; (ii) ওই বিষয়ে দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা; (iii) পাচার হয়ে যাওয়া নারীকে উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।
	ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগী যোজনা	২০১০	(i) ১৯ এবং তদূর্দ্ধ বছরের মায়েদের প্রসবকালে ও তৎপরবর্তী সময়ে উপযুক্ত পুষ্টির জোগান এবং নবজাতকের যথাযথ টিকাকরণ।
	সবলা প্রকল্প	২০১২	১০-১৯ বৎসর বয়সী বয়ঃসন্ধির মেয়েদের পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, বৃদ্ধি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান।
২০০৬-'১৫	নির্ভয়া ফান্ড	২০১৩	(i) মহিলাদের সুরক্ষা, পুনর্বাসন প্রভৃতি লক্ষ্যে প্রকল্প রূপায়ণ; (ii) ২০১৪-'১৫ ও ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে প্রতিবার ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়।
	বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প	২০১৫	(i) কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ, শিশুকন্যাকে সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (ii) দেশে ১০০-টি চিহ্নিত জেলায় কাজটি শুরু হয়; (iii) প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ মাত্র কোটি টাকা।
	ওয়ান-স্টপ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	২০১৫	(i) প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি এরূপ কেন্দ্র থাকবে; (ii) উক্ত কেন্দ্রে গৃহ-হিংসা, যৌন নিগ্রহ, ধর্ষণ, কন্যাপণ প্রভৃতি সমস্যা রোধ ও প্রয়োজনে সহায়তা দান করা হবে। (iii) পরবর্তীতে দেশের প্রতিটি জেলায় এরূপ কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব আছে।
	সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা	২০১৫	(i) কন্যা সন্তানের নামে ব্যাংকের বই খোলা, (সর্বাধিক দু'জন); (ii) প্রতি আর্থিক বছরে ১,৫০,০০০ টাকা সর্বাধিক জমা করা যাবে; (iii) ব্যাংক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেবে ও সুদ পুরোপুরি করমুক্ত। আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় ছাড়ও আছে; (iv) সর্বাধিক ১৪ বছর পর্যন্ত টাকা জমা করা যাবে; (v) উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা।

রাজ্য কোষাগারের অর্থে "কন্যাশ্রী প্রকল্প" গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল এ রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ পরিবারগুলির মেয়েদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন। দরিদ্র পরিবারগুলির কন্যাসন্তানরা যাতে দারিদ্র্যের কারণে মাঝপথে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে না দেয় সেজন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রী বাৎসরিক ৫০০ টাকা বৃত্তি পাবে এবং ১৮ বৎসর বয়সের পর এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান পাবে। এই অর্থ সরাসরি ছাত্রীর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

অষ্টম শ্রেণি বা তদূর্দ্ধ শ্রেণিতে পড়াশোনা করা মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে "সুকন্যা" প্রকল্পের মাধ্যমে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া "সবুজ সাথী" প্রকল্পে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের বাই-সাইকেল দেবার শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, সবলা, স্বাবলম্বন, স্টেপ, স্বয়ংসিদ্ধা, স্বাধার, সর্বশিক্ষা অভিযান প্রভৃতি নারী ক্ষমতায়নের অভিমুখী প্রকল্পগুলিও পশ্চিমবঙ্গে সবিশেষ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করা হচ্ছে।

উপসংহার

একথা ঠিক যে আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ যাবৎ বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে একদিকে যেমন, রয়েছে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প, অন্যদিকে নারীর সুরক্ষা ও অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ আইন প্রণয়ন, এমনকি সাংবিধানিক রক্ষাকবচেরও সংস্থান। কিন্তু প্রতিটি ব্যবস্থার রূপায়ণ কি যথাযথ হচ্ছে বা হয়েছে—এটাই আজ সবিশেষ প্রশ্ন। সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার জাঁতাকলে পড়ে এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি রাজকর্মচারি ও এক শ্রেণির অসৎ রাজনীতিকদের কারসাজিতে অধিকাংশ প্রকল্পের সুফলই শেষ পর্যন্ত প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছয় না, মাঝপথে দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে তার সুফল ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ২০১১ সালের জনগণনার নিরিখে নারী ও পুরুষের অসাম্য কেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকটভাবে প্রতীয়মান—

"নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে নারীকেই প্রধান এবং একমাত্র ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেই হবে চালক, অন্যের হাতের দম দেওয়া পুতুলমাত্র নয়। একবিংশ শতাব্দীর নারীর ক্ষমতায়নে এই মাইন্ড সেটের পরিবর্তন হয়ে উঠবে এক চ্যালেঞ্জ।"

সে কথা আজ নীতি নির্ধারকদের গুরুত্ব-সহ বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের জনগণনায় প্রতি হাজার জন পুরুষ-পিছু ভারতে মহিলা সংখ্যা ৯৩৩ জন। গ্রামাঞ্চলে সংখ্যাটি ৯৪৬, শহরাঞ্চলে ৯০০ জন। আবার হরিয়ানার মতো রাজ্যে মাত্র ৮৬১। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে শিশুকন্যার প্রতি নিত্য অবহেলা ও সামাজিক বঞ্চনাই নারীর সংখ্যা হ্রাসের কারণ।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে একটা কথা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রকৃত উন্নয়নের অর্থ যদি হয় দেশের দরিদ্রতম মানুষটির জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলা যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন, তাদের সার্বিক উন্নয়নই প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উন্নয়নের সুফল ওই পর্যায়ের মহিলাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও প্রকল্পের সুফলের সিংহভাগ উচ্চতর শ্রেণির মহিলারা পাচ্ছেন, আর এক বিরাট অংশের নারীসমাজ এর বাইরে থেকে যাচ্ছে। সাক্ষী-সিন্ধু-দীপা-রা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রমাণ করার আগে অবধি প্রচারের আলো তাদের ওপর পড়েনি। প্রবল নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সম্বল করে নিজেদের যে জায়গায় তারা তুলে এনেছেন, তার মূলে তো আত্মশক্তি। সরকারি সাহায্য তারা হয় তো পেয়েছেন—সে তো কত পুরুষও পেয়ে এসেছে—কিন্তু বহুবিধ বাধা অতিক্রম করে তারা আজ যা অর্জন করেছেন তাই তো প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন।

বর্তমান নিবন্ধটি কবিগুরুর গানের দু'টি বিখ্যাত পংক্তি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, সে যেন অমোঘ এক বাণী, আর শেষেও তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প "পাত্র ও পাত্রী"-র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এক্ষেত্রে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছেন, আজও তার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তাঁর অপূর্ব পর্যবেক্ষণ (ধর্মীয় আচার-আচরণে অভ্যস্ত প্রাচীনা মেয়েরা যেমন) "নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, (আধুনিকা) মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি অ্যাকসেন্টের একটু খুঁত কিংবা কাঁটা চামচের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়"

সমস্যাটা তাই বোধহয় এইখানে, যাকে বলে মাইন্ড সেট। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে নারীকেই প্রধান এবং একমাত্র ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেই হবে চালক, অন্যের হাতের দম দেওয়া পুতুলমাত্র নয়। একবিংশ শতাব্দীর নারীর ক্ষমতায়নে এই মাইন্ড সেটের পরিবর্তন হয়ে উঠবে এক চ্যালেঞ্জ।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক অধ্যাপক, "গ্রামোন্নয়ন বিদ্যাচর্চা বিভাগ" কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, এন.আই.আর.ডি., হায়দরাবাদ। ইমেল : dr.udaybhanu@hotmail.com)

WBCS ই যদি লক্ষ্য হয়

পড়তে যাচ্ছো? ✓ বই কিনছো? ✓

মক দিচ্ছো? ✓ স্টাডিম্যাট সংগ্রহ করছো? ✓

এবার নিজেকে প্রশ্ন করো

এক বারেই পাবে? ? প্রশন যেমনই হোক তুমি কাট-অফ পেরোবেই? ?

মেইন এর কমপ্লিট নোটস্ হাতে আছে? ? মেনই এর সম্পূর্ণ উত্তর কোন্ কোন্ বইতে আছে? ?

উত্তরের কিছুটা শেয়ার করলাম প্রিলি ও মেইন পরীক্ষার জন্য

WBCS ২০১৭ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ হল ২৯ জানুয়ারী, ২০১৭

- প্রথমে ঠিক করে নাও কি পড়বে? কোথা থেকে পড়বে?
  না হলে ভেলুথাম্পি বা এজভা মুভমেন্ট এত কিছু করেও টেম্পল এন্ট্রি-র মতো প্রশ্ন (২০১৬/জিএস-১/C সেট-এর ৫৯নং দাগ) আটকাবে। প্রিলিতেও গান্ধীজীর প্রথম গণ আন্দোলন কোনটা দাগাতে দ্বিধা হবে।
- অপশন দেখে কনফিউশন যেনো না হয়।
- প্রশ্ন যেমনই হোক কোয়ালিফাইং জোন কিন্তু প্রত্যেকবার ট্যুইস্ট করে তোমাদের সামনে আসে। এটাকে ধরার চেষ্টা করো।

সবশেষে

আমাদের সাফল্যের ছবি দিলাম না। শুধু প্রশ্ন রাখলাম - সাফল্যের টেকনিক ঠিকঠাক প্রয়োগ হলে একবারে ১০ জনে ২ জন বা ১০০০ জনে ৩০ জন সফল হয় কি? এই সকল ছেলেমেয়েরা কিন্তু একাই সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে। বাকী ৮০ শতাংশ কবে সফল হবে? কিভাবে?
প্রশ্নটা ভাবালে এসে দেখা করতে পারো।

5 টিচার্স গ্রুপ। ৯৫৯৩৪১১৪৩২ / শিয়ালদহ / কাটোয়া / বর্ধমান

মেইন-এর সলভ উত্তর (১৪-১৬) ও ট্রেন্ড অ্যানালিসিস প্রথম আমরাই দিচ্ছি। সেন্টারে এসে নিতে পারো।
গ্রুপ-সি / গ্রুপ-ডি-ইন্টারভিউ সেশন চলছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন
বহু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি

*মুঘল সম্রাট শাহজাহান-এর বেগম মুমতাজ মহল ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মারা যান চোদ্দতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। সম্রাট তার স্মৃতিতে আগ্রায় বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেন। অথচ, প্রায় একই সময়ে সুইডেন-এর এক রানির প্রসবকালীন জটিলতা দেখা দিলে, রাজা ফরাসি দেশ থেকে ডাক্তার এনে তার চিকিৎসা ও জীবনরক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, ধাত্রীবিদ্যায় গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য পরবর্তীকালে তিনি দেশে নার্সিং স্কুলও গড়ে তোলেন। বর্তমানে, সুইডেন-এ মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) এবং নবজাতক মৃত্যুর হার (IMR) বিশ্বে সবচেয়ে কম, যথাক্রমে ৮ এবং ৫। তুলনায় ভারতে ২০১৪ সালে IMR ছিল ৩৮ আর ২০১৩ সালে MMR ছিল ১৬৭; এই তথ্য-পরিসংখ্যান থেকেই খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় এ দেশে মহিলারা কী পরিস্থিতিতে আছেন। শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা—সমস্ত দিক থেকেই তারা পুরুষদের তুলনায় কয়েক যোজন পিছিয়ে। কাজেই, এ দেশে মহিলাদের কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতায়ন এখনও সোনার পাথরবাটি। সূচনা হয় তো হয়েছে, কিন্তু এখনও পাড়ি দিতে বাকি বহু পথ। লিখেছেন—***ড. সুভাষ শর্মা***

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে মানবজাতির মুক্তি (সংগ্রাম) হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তা 'নারী' ও 'ক্রীতদাস'—এই দুই শ্রেণির জীবনে মুক্তির বার্তা নিয়ে আসেনি। কারণ, বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে কেবল 'পুরুষ' এবং 'নাগরিক'-দের অধিকারগুলির (Rights of Man and Citizen) উপরই আলোকপাত করা হয়। 'নাগরিক'-এর সংজ্ঞায় 'নারী' ও 'ক্রীতদাস'-দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আর নারীরা (Women) তো পুরুষ (Men) নন, কাজেই...। যদি আমরা জীববৈজ্ঞানিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্ক/ক্রিয়া/কর্মকাণ্ডের উপর চোখ বোলাই তবে কয়েকটি শব্দ ঘুরে-ফিরে আসবে আমাদের সামনে। যেমন কী না পার্থক্য বা ফারাক (difference), তফাৎ (distance), বৈষম্য (discrimination), বঞ্চনা (deprivation) এবং অ-ক্ষমতায়ন (disempowerment)। বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতে দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে পুরুষমানুষেরাই সর্বেসর্বা (be-all) এবং সর্বশেষ (end-all) বলে গণ্য হন। কাজেই, নারী-পুরুষ সম্পর্কটা এখানে কখনও সমকক্ষ নয়। উদাহরণ পেশ করা যাক। জাতীয় স্তরে বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তির নিরিখে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের থেকে কম। ৬-৯ বয়ঃসীমায় শতাংশের হিসাবে ছাত্রী সংখ্যা ৯৫.৪; ১০-১৪ বছর বয়ঃসীমায় ৯৩.৭; এবং ১৫-১৭ বছর বয়ঃসীমায় ৮৩.৮। মেয়েদের শিক্ষার নিরিখে দেশের শীর্ষ পাঁচ রাজ্য হল কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর। আর তালিকার নিচের সারির পাঁচ রাজ্য হল রাজস্থান, গুজরাত, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ। ১৯৪৮ সালের সমমজুরি আইন (Equal Remuneration Act, 1948) সত্ত্বেও একই কাজের জন্য (সমস্ত জাত, ধর্ম, অঞ্চল নির্বিশেষে) মহিলাদের ২০ থেকে ৫০ শতাংশ কম মজুরি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় জায়গাতেই এই বৈষম্য বজায় থাকলেও শহরাঞ্চলে নারী ও পুরুষ উভয়েই গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি মজুরি পেয়ে থাকেন। এছাড়াও, শিক্ষাগত মান বৃদ্ধির সমান্তরালে নারী ও পুরুষ কর্মীদের মজুরিতেও বৃদ্ধি ঘটে এবং উভয় শ্রেণির মধ্যে মজুরির পরিমাণের পার্থক্যটাও ক্রমশ কমতে থাকে। তিনটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

(ক) দারিদ্র্য এবং মহিলারা সমার্থক। অর্থাৎ, সোজা কথায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে দরিদ্রের হার অনেক অনেক বেশি।

(খ) মহিলারা যখন কাজের খোঁজে বাইরে বার হন, তখন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে তথা চুক্তিভিত্তিক চাকরি-বাকরিই জোটাতে পারেন।

(গ) নারীদের প্রতি যৌন শোষণ—কম বয়সী মেয়ে/নারী পাচারের প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কলগার্ল এবং দেহ ব্যবসারও তত বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভারতে মহিলাদের স্বাস্থ্য চিত্রটাও এখনও মোটেই সন্তোষজনক নয়। মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) প্রতি লক্ষে ২০০০ সালের ৩০১ থেকে কমে ২০১৩ সালে হয় ১৬৭; সৌজন্যে উন্নত চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার বিস্তার। তাসত্ত্বেও এখনও হাজার হাজার মহিলা বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত প্রসব জটিলতার দরুন মারা যান। এসব কারণের মধ্যে মুখ্য

হল, রক্তক্ষরণ (Haemorrhage)—৩০ শতাংশ, রক্তাল্পতা (Anaemia)—১৯ শতাংশ; রক্তদূষণ (Sepsis)—১৬ শতাংশ, বাধাপ্রাপ্ত প্রসব (obstructed labour)—১০ শতাংশ, রক্তদূষ্টি (Toxaemia)—৮ শতাংশ এবং অন্যান্য কারণে ১৭ শতাংশ। এর জন্য দায়ি হল দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সচেতনতার অভাব, তথা চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার (যেমন, হাসপাতাল, শয্যা, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির সংখ্যা ও ওষুধপত্রের অভাব) অপ্রতুলতা। তবে আশার কথা হল, ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, অর্থাৎ হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশু জন্মের সংখ্যা ৪২ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৮৪ শতাংশ। সৌজন্যে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)।

পরের ইস্যুটি হল ভারতে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধমূলক ঘটনার হার উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই সব অপরাধের তালিকায় মূলত থাকছে ধর্ষণ, অপহরণ, শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, পণজনিত কারণে বধূহত্যা ইত্যাদি। ২০১৩ সালে দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের মোট ৩.০৯৫ লক্ষ ঘটনা (পুলিশের খাতায়) নথিভুক্ত হয়। কিন্তু অপরাধের বিচার তথা সাজাপ্রাপ্তির হার একেবারেই সন্তোষজনক নয়; মাত্র ২২ শতাংশ। পূর্ববর্তী দু' বছরে, অর্থাৎ, ২০১২ এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ছিল যথাক্রমে ২১ শতাংশ এবং ২৭ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১১ সালে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির (Fast track) জন্য বিচারালয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল ৫০০; ২০১৩-১৪ সালে সেই সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ২১২-তে। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে ভারতে ২.৬৩ লক্ষ ধর্ষণের কেস নথিভুক্ত হয়। লজ্জার কথা হল, এ দেশে প্রতি ২০ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। আরও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, ৬৫ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা তখনই ঘটে, যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মহিলারা রাতে ঘরের বাইরে বার হন। উল্লেখ্য, দেশে এখনও পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্য করেন জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। এদিকে, এ ধরনের বহু অপরাধের ঘটনা পুলিশ থানায় রিপোর্ট করা হয় না। এর পিছনে বিবিধ কারণ আছে। যেমন কী না, সচেতনতার অভাব, অভিযুক্ত/সমাজবিরোধী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভীতি, স্থানীয় পুলিশের অসহযোগিতা, সমাজে দুর্নামের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ভাবনার বিষয় হল, গণধর্ষণের ঘটনা যেমন একদিকে উত্তরোত্তর বাড়ছে, পাশাপাশি ধর্ষণের পর নিগৃহীতাকে প্রাণে মেরে ফেলার প্রবণতাও বাড়ছে। আমাদের স্মৃতিতে এখনও টাটকা ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয়া দিল্লির সেই কালো রাত। যেদিন ঘটেছিল 'নির্ভয়া'-র গণধর্ষণ ও তার উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা। যে ঘটনার প্রতিবাদে দলে দলে সাধারণ মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠেন। পরিশেষে, বিচার ব্যবস্থা নতুন নজির গড়ে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন বাদে প্রত্যেককে প্রাণদণ্ডের রায় দেয়। ঘটনার সময় নাবালক ছিল, এই যুক্তিতে এক অভিযুক্ত তিন বছর জুভেনাইল হোম-এ থেকে ছাড়া পায়। তবে নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের আপিলের বিষয়টি এখনও সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

"ভারতে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধমূলক ঘটনার হার উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই সব অপরাধের তালিকায় মূলত থাকছে ধর্ষণ, অপহরণ, শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, পণজনিত কারণে বধূহত্যা ইত্যাদি। ২০১৩ সালে দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের মোট ৩.০৯৫ লক্ষ ঘটনা (পুলিশের খাতায়) নথিভুক্ত হয়। কিন্তু অপরাধের বিচার তথা সাজাপ্রাপ্তির হার একেবারেই সন্তোষজনক নয়; মাত্র ২২ শতাংশ। পূর্ববর্তী দু' বছরে, অর্থাৎ, ২০১২ এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ছিল যথাক্রমে ২১ শতাংশ এবং ২৭ শতাংশ।"

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় নীতি (২০০১)

সংশ্লিষ্ট নীতিতে লিঙ্গ (সাম্য) বিকাশ নির্দেশক/সূচক (Gender Development Indices বা GDI) তৈরির বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করতে জোর দেওয়া হয়েছে। এটা জরুরি বেশ কয়েকটি কারণে। যেমন—উন্নততর পরিকল্পনা প্রণয়ন; কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি তথা পর্যাপ্ত সহায়সম্পদ বরাদ্দ করা; লিঙ্গ (সাম্য)-এর পক্ষে ক্ষতিকর তথ্য-পরিসংখ্যান (Gender disaggregated data) সংগ্রহ। এই নীতি বলে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে পরিষদ গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদ (National Council)-এর শীর্ষে আছেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য পরিষদ (State Council)-এর শীর্ষে আছেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই সব পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও, জাতীয় ও রাজ্য মহিলা কমিশন, সমাজ কল্যাণ পর্ষদ, অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO), মহিলা সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন (Trade Union), কর্পোরেট ক্ষেত্র, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রতিনিধিরা সদস্য হিসাবে সামিল হন সংশ্লিষ্ট পরিষদে। আছেন শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরাও। সমস্ত মন্ত্রক/দপ্তরের থেকে তহবিল/সুবিধার ৩০ শতাংশ যাতে মহিলাদের কাছে পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Women's Component Plan)-য়। এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সঞ্চালক (Nodal) মন্ত্রক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রককে।

সংশ্লিষ্ট নীতির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল :

- জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি, বিকাশ ও ক্ষমতায়ন।
- মহিলাদের চাহিদা/প্রয়োজনীয়তার প্রতি সংবেদনশীল আরও সক্রিয় বিচার-আইন ব্যবস্থা।

● ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

● উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ (Gender)-এর আনুপাতিক পরিপ্রেক্ষিতকে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

● প্রাসঙ্গিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপত্রের রূপরেখা তৈরি এবং তাকে আরও জোরদার করে তোলা।

● গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

● আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং উপ-আঞ্চলিক স্তরে অন্তর্রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা, অঙ্গীকার এবং সমঝোতাগুলির যথাযথ রূপায়ণ। বিশেষ করে, মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বৈষম্য পরিহার সংক্রান্ত চুক্তি (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women বা CEDAW) এবং শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (Convention on the Rights of the Child বা CRC)। এ দু'টিই রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ।

রাষ্ট্রসংঘের বিকাশ কর্মসূচি (United Nations Development Programme বা UNDP) আটটি সহস্রাব্দ বিকাশ লক্ষ্য (Millennium Development Goals বা MDG) ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে তৃতীয় লক্ষ্যটি ছিল সরাসরি মহিলাদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত স্তরে, অর্থাৎ, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ অসাম্য (Gender disparity) বর্জন করা হবে। কিন্তু ২০১৫ সালের মধ্যে সেই লক্ষ্য আমরা আদৌ অর্জন করতে পারিনি। যদিও ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির ক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। সারা ভারতেই অঞ্চল এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই অগ্রগতির ছবিটা ধরা পড়েছে। একই সাথে, নবজাতক, শিশু এবং মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাও আমরা ছুঁতে পারিনি। যদিও এক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। একই রকমভাবে দেখছি উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের সৌজন্যে কর্মসংস্থানের হার তথা সুযোগ ব্যাপক বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যোগদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কোথায়? ছবিটা সত্যিই নিরাশাজনক। বাস্তবে, ভারতীয় অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি চাকরিহীন বৃদ্ধি (Jobless growth)। তবে, বর্তমানে উৎপাদন (manufacturing) ক্ষেত্রে ছবিটার খানিকটা ইতিবাচক বদল ঘটেছে। দারিদ্র্যসীমা বিষয়ে তেণ্ডুলকার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশের জনসংখ্যার ২৯.৮ শতাংশ (অর্থাৎ, প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ) দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাস করেন। হিসাবটা ২০০৯-১০ সালের। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেলেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। যদিও বৃদ্ধি হার (Growth rate) ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ২০০২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তা সব সময়ই ৭.৫ শতাংশের উপরে থেকেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের ওপরও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টার্গেট রাখা হয়েছে—মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) কমিয়ে ৭০-এ, নবজাতক মৃত্যুহার (IMR) কমিয়ে ১২-তে এবং শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে ২৫-এ আনার। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় সকলকে নিয়ে আসার। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সাধারণ শিক্ষা সবার জন্য। রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য আনার টার্গেট এবং শিশুকল্যাণ ও মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের হিংসা প্রতিহত করার লক্ষ্য।

এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, শিক্ষিত ও কর্মরত মহিলারা পরিণত বয়সে বিয়েশাদি, সন্তান জন্মে বিলম্ব, বন্ধ্যাত্বকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আকারে ক্ষুদ্র পরিবার পছন্দ করেন। কাজেই মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা ও তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আরও বেশি সহায়সম্পদের বরাদ্দ, মেয়েদের মধ্যে এই লক্ষ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়ানো—এসবই আজ সময়ের দাবি। এই লক্ষ্যপূরণে আশু বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। যেমন—মেয়েদের জন্য স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত বিনা খরচে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া। পাশাপাশি উন্নত মানের স্কুল/ কলেজ তথা উন্নততর পরিকাঠামো (যেমন—বিল্ডিং, শৌচাগার, গ্রন্থাগার, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা) গড়ে তোলা; পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক/শিক্ষিকার বন্দোবস্ত করা। আর একটা দিক হল পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নজর দিতে হবে শিক্ষার্থীদের (কারিগরি) দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেই। এবং তা করতে হবে স্কুল-কলেজ স্তর থেকেই। সমস্ত স্কুল-কলেজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা অর্জন, দক্ষতার বৃদ্ধি এবং বহুমুখী দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যপূরণে একটি সংগঠিত অভিযান চালাতে হবে। এই অভিযানের অঙ্গ হিসাবেই মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আইটিআই ও পলিটেকনিকগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাজার, রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজের বাণিজ্যিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এইসব প্রতিষ্ঠানের (পঠনপাঠন সূচিতে) পরিবর্তন আনতে হবে। ইতোমধ্যেই দক্ষতার বিকাশ ও উদ্যোগ স্থাপন বিষয়ক নতুন একটি মন্ত্রক—Ministry of Skill Development and Entrepreneurship তৈরি করা হয়েছে।

মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিবিধ প্রকল্প

বয়ঃসন্ধির মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নামাঙ্কিত একটি প্রকল্প হল 'সবলা'। প্রকল্পটি সারা ভারত জুড়ে ২০৫-টি নির্দিষ্ট জেলায় সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (ICDS)-এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়। প্রকল্পটির দু'টি ভাগ আছে। একটি হল প্রকল্পভুক্ত মেয়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা জোগানো। এক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি খাওয়ানো, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনে বড় হাসপাতালে রেফার করা ইত্যাদি পরিষেবা দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ বিষয়ে তাদের কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পের এই দিকটির খরচের ৫০ শতাংশ বহন করে কেন্দ্র। প্রকল্পের অন্য

দিকটি হল ১৬-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য বৃত্তি প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা। এই দিকটির খরচের ১০০ শতাংশই কেন্দ্র বহন করে। ২০১৪-১৫ সালে (৩১.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত) এই প্রকল্পের আওতায় ৯৮.১৫ লক্ষ মেয়েকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা জোগানো হয়েছে এবং ০.৪২ লক্ষ মেয়েকে বৃত্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সাফল্য কাহিনীর একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এ কাহিনী আমাদের এ রাজ্যেরই মালদা জেলার ইংলিশ বাজারের বাসিন্দা কাজল ভগৎ-এর। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অনুপ্রেরণাতেই কাজল স্কুলের পড়া ছেড়ে ১৮ বছরের আগে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। আর একটি প্রকল্প হল "মাতৃত্ব সহায়ক যোজনা"। ICDS-এর মাধ্যমে সারা দেশের নির্দিষ্ট ৫৩-টি জেলায় প্রথম চালু হয়। ১৯ বছর বা তার বেশি বয়সী গর্ভবতী মহিলারা তাঁদের প্রথম দু'টি জীবিত শিশু জন্মের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন থেকে শিশুকে দুগ্ধপান করানোর সময়পর্বের মধ্যে দু'টি সমান কিস্তিতে মোট ৬০০০ টাকা পান। কেন্দ্রীয় সরকার পোষিত এই প্রকল্পটি চালু আছে ২০১০-১১ সাল থেকে। প্রথমে ৫৩-টি জেলায় চালু করা হলেও পরবর্তীকালে অতিরিক্ত আরও ২০০-টি জেলায় এই প্রকল্পকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং ২০১৬-১৭ সালে দেশের সমস্ত জেলাকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (২০১৩)-এর বন্দোবস্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প খাতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৪৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করে।

তৃতীয় প্রকল্পটি হল স্বধার (Swadhar)। মূলত প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার মহিলাদের জন্য চালু করা হয় এই প্রকল্পটি। স্বজন পরিত্যাক্ত বিধবা মহিলা, কারামুক্ত মহিলা বন্দি, জাতীয় বিপর্যয়ের ঘটনায় উদ্ধার পাওয়া গৃহহীন মহিলা, পাচার হয়ে যাওয়ার পর পতিতালয় থেকে উদ্ধার করা গেছে বা পালিয়ে এসেছেন এমন মহিলা, আতঙ্কবাদী/জঙ্গি হিংসার শিকার এরকম সহয়াসম্বলহীন মহিলা, সহায়সম্বলহীন মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলা, HIV/AIDS আক্রান্ত স্বজন পরিত্যাক্ত মহিলা—মূলত এদের জন্যই ২০০১-০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি চালু করে। এই প্রকল্পের আওতায় এইসব প্রান্তিক মেয়ে/মহিলাদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র এবং পরিচর্যার বন্দোবস্ত করা হয়। ব্যাপকতর অর্থে এদের পুনর্বাসনের জন্য মানসিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও আইনি সহায়তারও বন্দোবস্ত করা হয়। দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের পরামর্শদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্প লাইনও চালু রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশজুড়ে, রাজ্য সরকারগুলির মহিলা বিকাশ নিগম বা অছি ইত্যাদির তত্ত্বাবধানে ৩১১-টি স্বধার হোম চালু আছে। ২০১৩-১৪ সালে স্বধার প্রকল্পে ৭৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে খরচ করা হয় ৫৩.৭৪ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালে এই প্রকল্প খাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

চতুর্থ প্রকল্পটি হল 'উজ্জ্বলা' (Ujjawala)। এটি চালু আছে ২০০৭ সাল থেকে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য নারী পাচার প্রতিরোধ। এই প্রকল্পে নারী পাচারে বাধাদান, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধার, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদির ওপর নজর দেওয়া হয়। ২০১৪-১৫ সালে এই প্রকল্পের আওতায় ২৮৯-টি প্রজেক্টে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৫-টি নিরাপত্তাদায়ক পুনর্বাসন হোম গড়ে তোলা হবে।

"কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই এই ব্যাপারটি অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যে, মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৩০ শতাংশ যেন অন্তত তৃণমূল স্তরে ব্যয় করা হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি-বাকরিতে মহিলাদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সমস্ত সরকারি সংস্থাকে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাশাপাশি, বেসরকারি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের নিয়োগের চল আরও অনেকখানি বাড়াতে হবে। এভাবেই যথার্থ লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবে।"

পঞ্চম প্রকল্পটি হল STEP (Support to Training and Employment Programme)। নাম থেকেই স্পষ্ট (মহিলাদের) প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানে সাহায্য করার জন্যই এই কর্মসূচিটি চালু করা হয়। ১৬ বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের জন্য বেশ কয়েক দশক আগে, ১৯৮৬-৮৭ সালে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি চালু হয়। ২০১৩-১৪ সালে বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকল্প খাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

কেন্দ্রীয় সহায়তায় মহিলাদের জন্য অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল। ৩১.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত এ ধরনের হস্টেলের সংখ্যা ৯১৫ এবং সেখানে আবাসিক কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা ৬৮,৬৩১। ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে কর্মরত মহিলাদের জন্য আরও হস্টেল নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও একটি উদ্যোগ হল "স্ত্রী শক্তি পুরস্কার" প্রদান। জাতীয় স্তরে ব্যক্তিবিশেষ/প্রতিষ্ঠানকে ৩ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও, প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি করে "রাজ্য মহিলা সম্মান" প্রদান করা হয়, যার সম্মান মূল্য ৪০,০০০ টাকা। আর দেশের প্রতিটি জেলার জন্য রয়েছে একটি করে "জিলা মহিলা সম্মান", যার সম্মান মূল্য ২০,০০০ টাকা।

সর্বোপরি রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও"।

কিছু পরামর্শ

Van Staveren সঠিক অর্থেই মহিলাদের নিজ অভিরুচি মতো প্রজনন স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় নিশ্চিত করতে সুপারিশ করেন।

- গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাপত্রের সুযোগ-সুবিধার নাগাল।
- সন্তানের জন্ম দেবেন কি না, সন্তানের (biological) পিতা নির্বাচন, যদি শিশুর জন্ম দিতে ইচ্ছুক হন তবে কখন এবং কয়টি সন্তানের জন্ম দেবেন—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকা।
- বাবা-মা এবং সন্তানদের (প্রজননগত) স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত।
- মাতৃত্ব/পিতৃত্ব-এর পরিবর্তে বিকল্প ভূমিকা পালনের সুযোগ।
- অর্থনৈতিক সহায়সম্পদের নাগাল।

যাইহোক, আজকাল পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত পন্থাপদ্ধতির প্রচার আগের মতো জোরদারভাবে চালানো হয় না। সুতরাং, এই ব্যাপারটির দিকে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই এই ব্যাপারটি অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যে, মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৩০ শতাংশ যেন অন্তত তৃণমূল স্তরে ব্যয় করা হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি-বাকরিতে মহিলাদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সমস্ত সরকারি সংস্থাকে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাশাপাশি, বেসরকারি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের নিয়োগের চল আরও অনেকখানি বাড়াতে হবে। এভাবেই যথার্থ লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবে। এ দেশে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি (Self-help groups) যে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেনি তার জন্য মূলত দায়ি অর্থসহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির তরফে অসহযোগিতা।

তৃতীয়ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আইনসভা-গুলিতে (Legislative bodies) মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এখনও উদাসীনতা রয়েছে। যদিও লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের (আসন) সংরক্ষণ বিষয়ক বিলটি ২০১০ সালেই রাজ্যসভায় পাস হয়ে গেছে, কিন্তু লোকসভায় এখনও পাস করানো যায়নি। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহারাষ্ট্র, বিহার, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান—এই পাঁচ রাজ্যে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। দেশের বাদবাকি রাজ্যগুলিকে সেখানে কেবল এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

চতুর্থত, উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন ধামে হাজার হাজার বিধবা মহিলা চরম বঞ্চনাময় একাকী নিঃসঙ্গ অমানবিক জীবন যাপন করছেন। তারা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানকার (বিধবা) আশ্রমের জমি-জায়গা মাফিয়া বিল্ডার্সদের দখলে চলে যাওয়ার দরুন এইসব অসহায় বিধবারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছেন। তাদের জন্য না আছে কোনও বয়স্কভাতা, না বিধবাভাতার ব্যবস্থাপত্র। এদের ক্ষেত্রে যৌন শোষণের ঘটনাও আকছার ঘটছে। নেই-এর তালিকাটা আরও দীর্ঘ। এদের জন্য কোনও ভোটার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ড-এর বন্দোবস্ত তো নেই-ই, সর্বোপরি মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধারও হদিশ নেই। একই রকমভাবে, সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা 'রেল লাইট' এলাকাগুলিতে যে ৩০ লক্ষ দেহোপজীবিনী মহিলার বাস, তাদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিকল্প জীবন-জীবিকার সুযোগের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা দরকার।

পঞ্চমত, দেশে মহিলা কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের অবস্থাও বেশ শোচনীয়। এর পেছনে বহু কারণ আছে। যেমন—বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মার, কৃষিজ উৎপাদন/কারিগরদের পরিষেবা এবং শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে অসম বাণিজ্য শর্ত, মুদ্রাস্ফীতির চড়া হার (মূলত মজুতদার, মধ্যবর্তী ব্যবসাদার/ফড়েদের কালোবাজারি এর জন্য দায়ি), নিম্ন ও অসম মজুরি হার, রুগ্ন স্বাস্থ্য, শৌচাগারের সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। ২০১৩-১৪ সালে বিহারে ৬০০০ মাতৃমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু জেলা প্রশাসনের তরফে মাত্র ৩৫২-টি মৃত্যুর ঘটনার রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল। বিহার রাজ্য স্বাস্থ্য সমিতি (State Health Society of Bihar) তা স্বীকারও করে নেয়। সংবাদপত্র টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে ৩১.০৮.২০১৪ তারিখে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। এ কাহিনী সকলেই জানেন প্রায় পৌনে চারশো (১৬৩১ সাল) বছর আগে মুঘল সম্রাট শাহজাহান-এর বেগম মুমতাজমহল শিশু জন্ম সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যান। সম্রাট তার স্মৃতিতে আগ্রায় তাজমহল তৈরি করেন। অথচ, প্রায় একই সময়ে, সুইডেন-এর এক রানির প্রসব সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিলে, রাজা ফরাসি দেশ থেকে ডাক্তার এনে তার জীবনরক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, ধাত্রীবিদ্যায় গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য পরবর্তীকালে তিনি নার্সিং স্কুলও গড়ে তোলেন। বর্তমানে, সুইডেন-এ মাতৃমৃত্যু হার (MMR) এবং নবজাতক মৃত্যুহার (IMR) বিশ্বে সবচেয়ে কম, যথাক্রমে ৮ এবং ৫। তুলনায় ভারতে এই দুই হারই যথেষ্ট বেশি। ২০১৪ সালে এ দেশে IMR ছিল ৩৮। যেখানে প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও নেপালেও এই হার ছিল ভারতের তুলনায় কম, যথাক্রমে ৩১ এবং ২৯। আর ২০১৩ সালে ভারতে MMR ছিল ১৬৭। ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ভারতে নবজাতক মৃত্যুহার কমেছে ৫০ শতাংশ, অথচ বাংলাদেশে এই হার কমেছে ৬৭ শতাংশ এবং নেপালে ৬৬ শতাংশ।

আসা যাক স্বাস্থ্য খাতে খরচের হিসাব-নিকাশে। ভারতে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত হয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এর মাত্র ১.৩ শতাংশ। তুলনায়, ব্রিটেন এই খাতে ব্যয় করে জিডিপি-র ৭.৬ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮.১ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের ছবিটাও একেবারেই সন্তোষজনক নয়। ভারতে এর পরিমাণ বার্ষিক ৬১ মার্কিন ডলার, শ্রীলঙ্কায় ১০২ ডলার, ব্রিটেনে ৩,৫৯৮ ডলার এবং মার্কিন মুলুকে ৯,১৪৬ ডলার। এ দেশে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আছেন জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা

এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা এই পরিপ্রেক্ষিতে এক শুভ উদ্যোগ। একই রকমভাবে, সাতটি মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শিশুদের জন্য "মিশন ইন্দ্রধনুষ" নামক টিকাকরণ কর্মসূচিও সঠিক দিশায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। "স্বচ্ছ ভারত অভিযান" নামক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিও একই রকমভাবে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারণ, স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ক্ষেত্রে ১ ডলার বিনিয়োগ করার অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ৯ ডলার বিনিয়োগ বাঁচানো। ভারতে, ৬৪০-টি জেলায় মাত্র ১৯৩-টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য) আছে। এ দেশে ৭০-৮০ শতাংশ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে বেসরকারি ক্ষেত্র। কাজেই, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপি-র অন্তত ২.৫-৩ শতাংশ করাটা আশু জরুরি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন কিছু বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়ন তথা আর্থ-সামাজিক বিকাশ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

পরিশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ করতে হয় তা হল, সারা দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য মাত্র ২১২-টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট রয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাটের মতো রাজ্যগুলি সময় মতো এ ধরনের কোর্ট তৈরি করেনি। এই কোর্ট গঠনে আর্থিক দায়ভার যেমন রাজ্যগুলির বহন করার কথা, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারও যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করে থাকে একাজে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক এ জন্য বছরে সর্বোচ্চ ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে থাকে, রাজ্যগুলির বরাদ্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বিগত বছরগুলিতে যখন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টগুলি চালাত, সেই সময়, ২০১১ সাল নাগাদ সারা ভারতে এ ধরনের বিচারালয়ের সংখ্যা ছিল ৫০০। পরবর্তী বছরগুলিতে সারা দেশজুড়েই মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই তুলনায় অপরাধীর বিচার ও দোষী সাব্যস্ত/শাস্তি প্রদানের হার ছিল অনেক অনেক কম। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০১৩ সালে যতগুলি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে মাত্র ২২ শতাংশ কেস-এ অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ২০০১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সারা দেশে পণের কারণে বধূহত্যার ঘটনা ঘটেছিল ৯১,২০২-টি; এর মধ্যে শুধু ২০১২ সালেই ৮,২৩৩-টি বধূহত্যার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রেও দোষী সাব্যস্ত/শাস্তি প্রদানের হার ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। এই হতাশাজনক ছবির পেছনে মূল কারণ হল পুলিশি তদন্ত, বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথ সক্রিয়তার অভাব। অর্থাৎ আইন প্রয়োগ ব্যবস্থায় গাফিলতি। তবে এখানে একথাটাও মনে রাখতে হবে পণের জন্য বধূ নির্যাতনের বহু মিথ্যা মামলাও সারা দেশেই দায়ের হয়। যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রথম সে রাজ্যের প্রতি জেলায় একটি করে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ হলেন নারী। এদের সামগ্রিক এবং যথাযথ ক্ষমতায়ন এখন সময়ের দাবি। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই লক্ষ্যে জোরদার তৎপরতা দেখাতে হবে। বিশেষ করে নজর দিতে হবে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে; তথা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি তাদের উপস্থিতিও সুনিশ্চিত করতে হবে। দেখতে হবে পুরুষ এবং নারী যাতে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন; একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠেন। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব বজায় থাকে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, মহিলাদের বন্ধন মুক্তির জন্য যে কৌশল নিতে হবে তা হল—চিন্তাভাবনাটা হবে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু কাজ করতে হবে স্থানীয় স্তরে।❑

সারণি-২
বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিবিধ পদক্ষেপ

উদ্দেশ্য	গৃহীত পদক্ষেপ	পরিকল্পনা
১. নারী কল্যাণ	ছাত্রীদের পড়াশুনোর জন্য জলপানি (stipend)-এর ব্যবস্থা। বিশেষত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সূচিশিল্প, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি কারিগরি শিক্ষার জন্য।	প্রথম-পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৭৯)
২. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সামিল করা	দারিদ্র্য দূরীকরণ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিকাশ।	ষষ্ঠ এবং সপ্তম পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৯০)
৩. মহিলাদের ক্ষমতায়ন	মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে, মেয়েরা যে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে, উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির সময় সেই পরিপেক্ষিত নজরে রাখা হয়।	অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-১৯৯৭)
৪. পরিবর্তনের মুখ হিসাবে মহিলাদের তুলে ধরা	দরিদ্র মহিলাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য স্বনির্ভরগোষ্ঠী। মহিলাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।	নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)
৫. মানবোন্নয়ন	সাক্ষরতার তথা মজুরি হারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কমাতে সুনির্দিষ্ট টার্গেট রাখা হয় এবং তার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা। মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে উদ্যোগ।	দশম ও একাদশ পরিকল্পনা (২০০২-২০১২)
৬. লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা	সমস্ত ক্ষেত্রের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সামিল করা।	দ্বাদশ পরিকল্পনা (২০১২-২০১৭)

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ইমেল : sush84br@yahoo.com)

ভারতে স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য

কতটা এগিয়েছি, কতটা এগোতে হবে

দেশ-কাল নির্বিশেষে ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত শিক্ষা। কাজেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। খুব ছেলেবেলায় আমরা সবাই পড়েছি "লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে"। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সমাজে সর্বকালে, সর্বদেশে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শিক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ফলত, সমস্ত দেশেই শিক্ষাক্ষেত্রে অল্পবিস্তর থেকে প্রচুর পরিমাণে লিঙ্গবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। আর ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তো এই বৈষম্য নানাভাবে, নানারূপে ডালপালা বিস্তার করেছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ভিন্নভাবে চিন্তা করার। তাই সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে অনিবার্য হয়ে উঠেছে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য ঘুচিয়ে নতুন পথের সন্ধান করার। একাজে কিছুটা আমরা এগিয়েছি, তবে এগোতে হবে আরও অনেকটা পথ। ঠেলে সরাতে হবে বাধার পাহাড়কে।

লিখেছেন—**শৈলেন্দ্র শর্মা** ও **ড. শশীরঞ্জন ঝা**

উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় নারীদের ক্ষমতায়নের ধারণা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে থেকেছে। সমাজে সর্বক্ষেত্রে/বিষয়ে নারীরাও যাতে পুরুষের সমান অধিকার তথা সুযোগ-সুবিধা পান, তা সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদের বাড়তি কিছু উদ্যোগ নিতে হবে, তৎপরতা দেখাতে হবে। এই উদ্যোগ, তৎপরতার সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি জায়গা করে নেওয়ার।

যদিও প্রকৃত অর্থে, নারীদের ক্ষমতায়ন মোটের উপর এখনও 'সোনার পাথর বাটি'। নারীকে প্রান্তিক করে রাখার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তাসত্ত্বেও, নারীশক্তির প্রান্তিকীকরণ রোধ করতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ তথা কর্মতৎপরতার একান্ত অভাব। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এক দু'মুখো গোঁড়ামি চোখে পড়ে। একদিকে, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অবহেলিত করা হয়; অপরদিকে, নারীর ছকে বাঁধা এক আদর্শ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে। দীর্ঘদিনের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই দ্বিচারিতার মধ্যে দিয়েই নারীকে তার অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখার প্রতিফলন ঘটে।

নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ও প্রান্তিকীকরণ দু'টি বিষয়কেই সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা দরকার। যে কোনও সমাজেই প্রান্তিকীকরণের প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণ করেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘ দিন ধরে এবং তার অস্তিত্বও বজায় থাকে সুদীর্ঘ সময়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এই দু'টি জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রকৃত অর্থে, প্রান্তিকীকরণকে ব্যক্তি পরিচয়, মর্যাদা ও ব্রাত্য করে রাখার সাপেক্ষে যাচাই করে নেওয়া দরকার। বিশেষত যখন নারীকে প্রান্তিক হয়ে পড়ার কারণে পিছতে পিছতে, উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। এইভাবেই মহিলারা সাধারণত সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং ক্রমে বিশেষভাবে অনগ্রসর এক শ্রেণিতে পরিণত হন।

"একজন মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দিলে তুমি ব্যক্তিবিশেষকে শিক্ষিত করবে, কিন্তু একজন নারীকে শিক্ষিত করলে পুরো সভ্যতা শিক্ষিত হয়ে উঠবে।"—মহাত্মা গান্ধী

সমাজে মহিলাদের এভাবে দাবিয়ে রাখা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আদ্যিকালের বস্তাপচা ধ্যানধারণার কারণে নীতি স্তরে লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে যতই হৈ-চৈ করা হোক, তা আদপেই কোনও কাজে আসছে না। মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রসঙ্গে সমর্থন তথা তাদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের উন্নতির জন্য কিছু নীতিগত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে, শুধুমাত্র অংশগ্রহণ ছাড়া মহিলাদের ব্যক্তি পরিচিতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি বা ব্রাত্য করে রাখার কারণ অনুসন্ধানের যথাযথ প্রচেষ্টা কদাচিৎ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের প্রান্তিকীকরণ বজায় রাখা হয়েছে বা আরও বাড়ানো হয়েছে।

দেশে কন্যাসন্তানের শিক্ষার বিষয়টি নীতি বৃত্তে ক্রমশ আরও বেশি স্বীকৃতি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কন্যাসন্তানের শিক্ষাকে উৎসাহ দানের বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরিকল্পনার

দস্তাবেজে, শুধুমাত্র ছেলেদের সাথে মেয়েদের তাল মেলানোই নয়; ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে কন্যাশিশুর শিক্ষার গুরুত্বও পুর্নব্যক্ত করা হয়েছে। এই নীতিতে বলা হয়েছিল, শিক্ষাই হল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সেই হাতিয়ার যা, নারীর আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে তথা সমাজে তার জায়গা মজবুত করবে। কিন্তু দ্বাদশ পরিকল্পনার রূপায়ণ পর্বে এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য আনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির রূপরেখা এমনভাবে তৈরি করা দরকার যে, এর গুণমান ও নিরপেক্ষতার বিষয়টি সমানভাবে বিবেচিত হয়। সম্ভবত, লিঙ্গ সংবেদনশীল পাঠক্রম তৈরি, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ ছাড়াও আরও কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়ারও প্রয়োজন আছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রসঙ্গ

● **কন্যাসন্তানের শিক্ষা :**

বরাবর প্রায় সমস্ত সমাজে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে এসেছে। সাক্ষরতার হার ও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ বৈষম্য চোখে পড়ে তার জন্য অতীতের সামাজিক প্রথা ও শিক্ষা নীতি দায়ি। ফলত, প্রায় সমস্ত দেশেরই শিক্ষা ব্যবস্থায় অল্পবিস্তর থেকে প্রচুর পরিমাণে লিঙ্গবৈষম্য চোখে পড়ে। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের মধ্যে একটি জোরালো পারস্পরিক সম্পর্ক থাকায় মানবসম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের দিকে সমস্ত দেশেরই উৎসাহ থাকে। শিক্ষা ও লিঙ্গ বিষয়ক আলোচনায় 'সাম্য' ও 'ন্যায়'-কে আলাদাভাবে বিবেচনা করাই সঙ্গত। সময়ের সাথে সাথে লিঙ্গ ন্যায়কেও আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া আশু প্রয়োজন।

● **জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ (১৯৯২ সালে সংশোধিত) :**

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বরাবরই বিভিন্ন নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে এসেছে। বিশেষত, জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NPE) ১৯৮৬/১৯৯২ বৈষম্য দূর করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল।

চিত্র-১

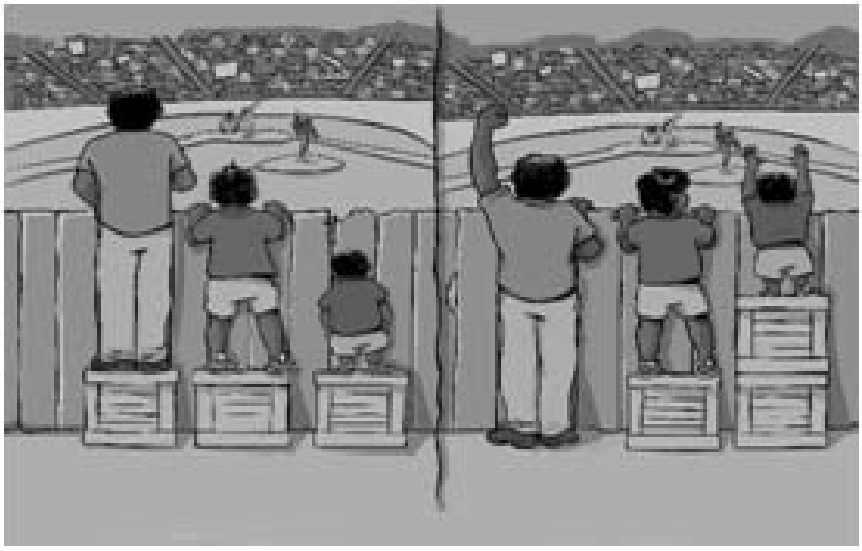

সাম্য ন্যায়

চিত্র-২

মহিলাদের অবস্থার প্রাথমিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। ভাবা হয়েছিল, অতীতের পুঞ্জীভূত বঞ্চনাকে প্রশমিত করে এই নীতি মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করবে। নতুনভাবে তৈরি পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও আগ্রহ; সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, প্রশাসক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি নতুন মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। বিশেষ সহায়ক পরিষেবা দিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যকরী নজরদারির মাধ্যমে মহিলা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষায় কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ বাড়ানো তথা শিক্ষা অর্জনের পথের বাধাগুলি সরানোটা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। বৃত্তিমূলক এবং পেশাদার কোর্সে মেয়ে ও ছেলেদের দক্ষতার পার্থক্য সম্পর্কিত বাঁধাধরা ধারণাগুলি হঠানোর জন্য লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য বিরোধী নীতি জোরালোভাবে অনুসরণ করা হবে। অপ্রচলিত পেশায় এবং প্রচলিত ও নতুন নতুন প্রযুক্তিগত তথা কারিগরী পেশায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে। NPE-র নির্দেশিকা অনুসরণ করে অনেকগুলি রাজ্য স্তরীয় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে—যথা, BEP, OBB, DPEP, SSA এবং RMSA। এই বিষয়ে শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন (The Right of Children to Free and Compulsory Act, 2009, সংক্ষেপে RTE Act) দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল মাইল ফলক।

● **নতুন শিক্ষা নীতি (NEP) ২০১৬-এর চ্যালেঞ্জ (খসড়া NEP, ২০১৬-এর জন্য কিছু রসদ) :**

NEP ২০১৬-র খসড়ায় যুব ও বয়স্ক মানুষের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অতি উচ্চ হারে লিঙ্গবৈষম্য একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতে যুব সাক্ষরতার হারে লিঙ্গবৈষম্য অনেকটাই বেশি রয়ে গেছে (৮.২ শতাংশের ফারাক)। ছেলেদের (বয়স ১৫-২৪) ক্ষেত্রে এই হার ২০১১ সালে ছিল ৯০ শতাংশ, আর সমবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ছিল ৮১.৮ শতাংশ। বয়স্ক মানুষদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও দেশে এই লিঙ্গভিত্তিক ফারাকের হার (২০১১ সালে ১৯.৫ শতাংশ) খুবই বেশি। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কন্যাশিশু ও মহিলাদের সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য জোরদার তৎপরতার সমূহ প্রয়োজন।

● **শিক্ষায় কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর কর্মসূচি :**

মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পন্থাপদ্ধতিকে জোরদার করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে কয়েকটি হল—National Programme for Education of Girls (NPEGEL), মহিলা সমক্ষা (MS), এবং কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (KGBV)। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার এর সঙ্গে আরও দু'টি প্রকল্প যোগ করেছে : SABLA এবং 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে এবং কেন্দ্রের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের অধীনে SABLA প্রকল্প চালু হয়েছে ২০১১ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে। দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত দুশোটি জেলায় ICDS প্রকল্প-ভুক্ত কিশোরীরা (বয়স ১১-১৮) এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে : কিশোরীদের আত্ম-বিকাশ ও ক্ষমতায়ন তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন; তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, প্রজনন-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য, পারিবারিক স্বাস্থ্য এবং শিশু পরিচর্যা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। এছাড়া গৃহকর্ম, কারিগরী শিক্ষা এবং জীবন ধারণের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষতা বাড়ানো এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। স্কুলছুট কিশোরীদের প্রথাগত এবং অ-প্রথাগত শিক্ষার আঙ্গিনায় ফিরিয়ে আনা এই প্রকল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষ্য। এই প্রকল্পে কিশোরীদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা (যথা, প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ডাকঘর, ব্যাংক, পুলিশ থানা, ইত্যাদি) সম্বন্ধে অবহিত করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও স্থির করা হয়েছে।

'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' (BBBP) প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল সরকারের নারীকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই পরিষেবাগুলির

চিত্র-৩
ভারতে সাক্ষরতার হার

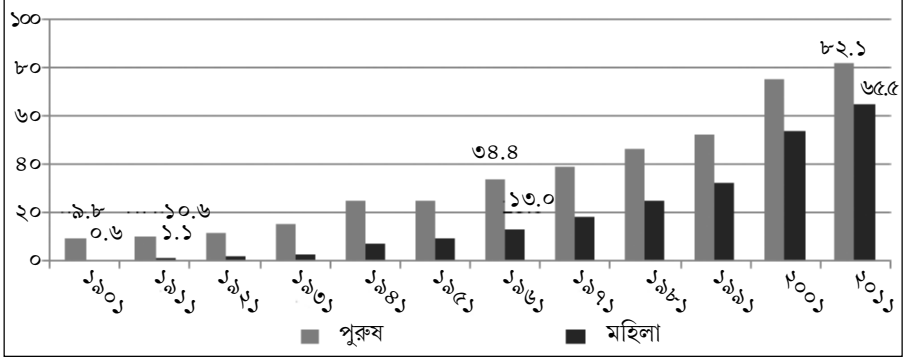

চিত্র-৪
তুলনামূলক লিঙ্গ অনুপাত (সূত্র : জনগণনা)

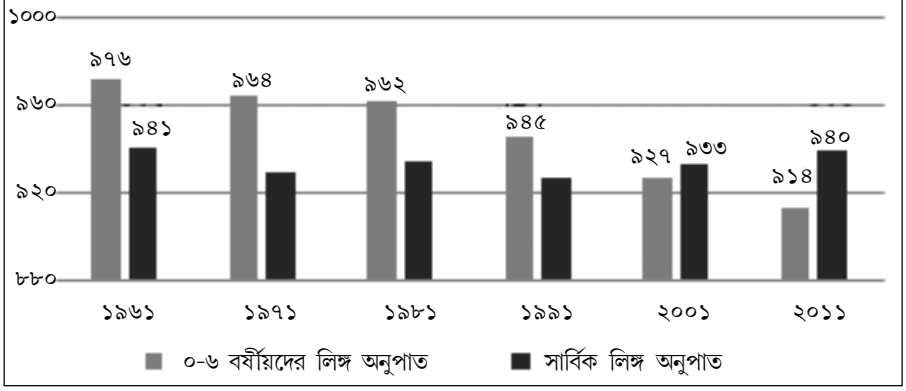

চিত্র-৫
সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে মেয়ে পড়ুয়াদের শতকরা হার (UDISE ২০১৪-'১৫)

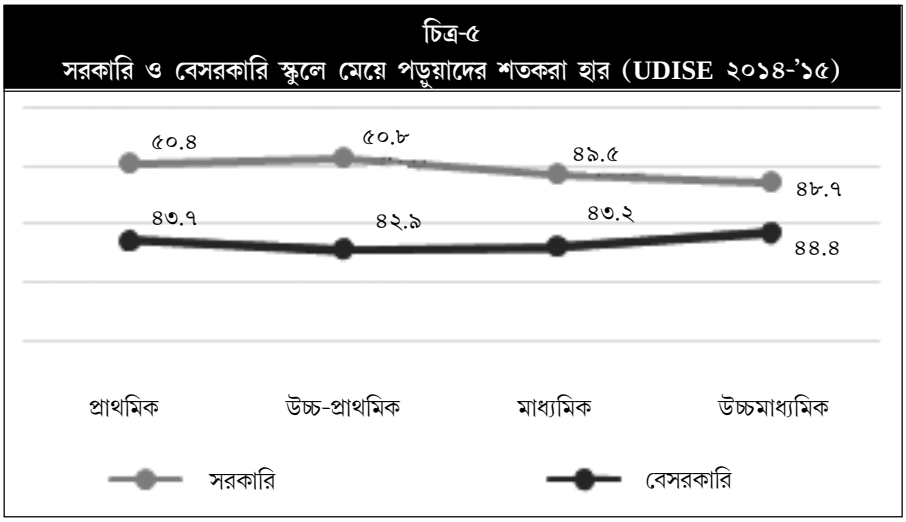

কার্যকারিতা বাড়ানো। ক্রমাগত কমতে থাকা শিশু লিঙ্গ অনুপাত (Child Sex Ration বা CSR) ঠেকানোর জন্য একশো কোটি টাকা (US $ 15 million)-র প্রাথমিক পুঁজি নিয়ে ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রকল্পটি শুরু করা হয়। দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত একশোটি জেলায় যেখানে শিশু লিঙ্গ অনুপাত খুবই কম, প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে। এর প্রধান অংশ হল সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশজোড়া প্রচার এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রকল্পটি কেন্দ্রের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ।

লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং চ্যালেঞ্জ

- **সাক্ষরতার হার :**

সারা বিশ্বের ৭৭৪ মিলিয়ন নিরক্ষর জনসংখ্যার মধ্যে অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্ক/পরিণত মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (২৮৭ মিলিয়ন) বাস করে ভারতবর্ষে। পৃথিবীর তাবৎ নিরক্ষর মানুষের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই মহিলা। দেখা গেছে যে, এই নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে অর্ধেক কখনও স্কুলের চৌহদ্দিতেই পা রাখেনি, আর বাকি অর্ধেক দেরিতে স্কুলে যেতে শুরু করে কিছু দিন পরেই পড়াশুনার পাঠ চুকিয়েছে।

গত একশো বছরে ভারতে পুরুষ ও মহিলা—উভয়েরই সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের সাক্ষরতার হার ১৯১১ সালে ১০.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ৮২.১ শতাংশ হয়েছে (৭২ শতাংশের বৃদ্ধি)। আর মহিলা সাক্ষরতার হার ওই একই সময়পর্বে ১.১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫.৫ শতাংশ (৬৪.৪ শতাংশের বৃদ্ধি)। কিন্তু পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হারের ফারাক ১৯১১ সালের ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬.৬ শতাংশ।

সামাজিক শ্রেণি অনুযায়ী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে মহিলা সাক্ষরতার হার (২০১১ সালে) যথাক্রমে

সারণি-১
মেয়েদের শতকরা হার (২০১৪-'১৫)

স্তর	সার্বিক	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি	মুসলমান
প্রাথমিক	৪৮.৩৪	৪৮.৫	৪৮.৩৭	৪৮.৬	৪৯.৭৯
মাধ্যমিক	৪৭.৪৬	৪৭.৬	৪৮.৪	৪৭.১৭	৫১.৭৪
উচ্চমাধ্যমিক	৪৭.০৬	৪৭.৫১	৪৭.০৯	৪৭.০৮	৫০.৮৫

সূত্র : ফ্ল্যাশ স্ট্যাটিসটিকস, ২০১৪-'১৫

চিত্র-৬
শ্রেণি অনুসারে মেয়েদের শতকরা হার

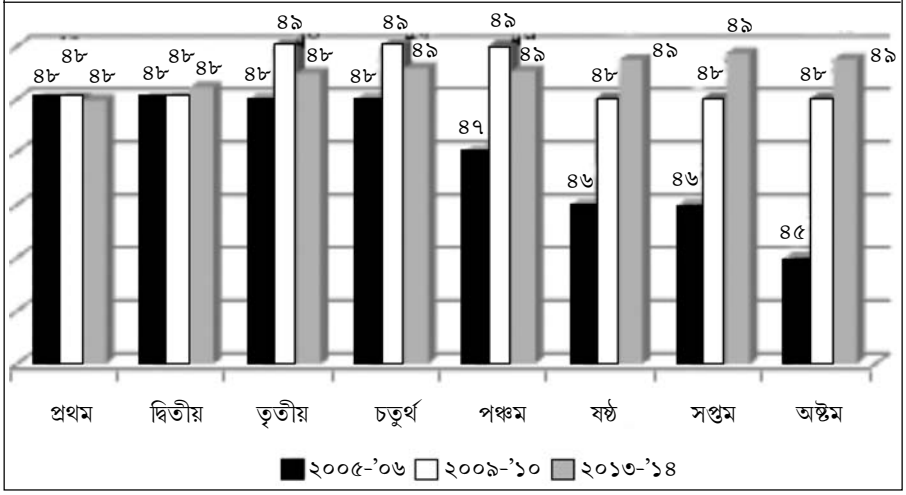

চিত্র-৭
গড় বার্ষিক স্কুলছুটের হার (UDISE ২০১৪-'১৫)

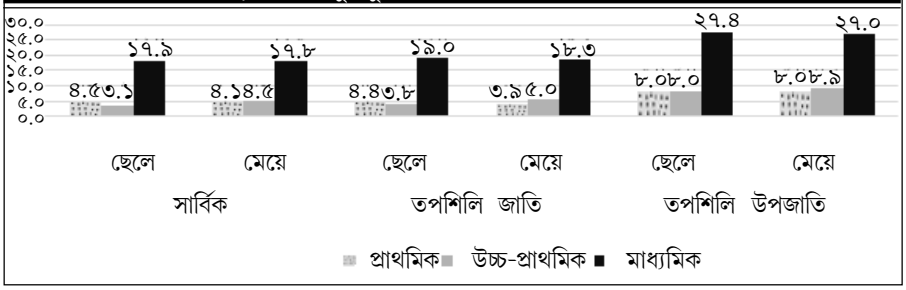

৫৬.৫ শতাংশ এবং ৪৯.৪ শতাংশ। যা কিনা সর্বভারতীয় গড় (৬৫.৫ শতাংশ)-এর তুলনায় অনেকটাই কম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে কেরালায় সাক্ষরতার হার (৯৪ শতাংশ) দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ (পুরুষ : ৯৬ শতাংশ এবং মহিলা : ৯২.১ শতাংশ); তার পরে আছে লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম, গোয়া এবং ত্রিপুরা। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাক্ষরতার বিচারে প্রথম দশের মধ্যে আছে ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং চারটি রাজ্য (কেরালা, মিজোরাম, গোয়া এবং ত্রিপুরা)। মহিলা সাক্ষরতার নিরিখেও ওই চারটি রাজ্যই প্রথম চারে আছে। অন্যদিকে বিহারে মহিলা সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম (৫২.৫ শতাংশ), যার ঠিক ওপরে আছে রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর। মহিলা সাক্ষরতার বিচারে সারণির সব থেকে নিচের দশটি রাজ্যের মধ্যে তিনটি তপশিলি জাতি প্রধান রাজ্য (বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ), চারটি তপশিলি উপজাতি প্রধান রাজ্য (মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও অরুণাচলপ্রদেশ), আর

সারণি-২												
আর্থিক সম্পদ বিভাগ	প্রাথমিক ২০০৭			প্রাথমিক ২০১৪			উচ্চ-প্রাথমিক ২০০৭			উচ্চ-প্রাথমিক ২০১৪		
	পুরুষ	মহিলা	পুং-স্ত্রী পার্থক্য	পুরুষ	মহিলা	পুং-স্ত্রী পার্থক্য	পুরুষ	মহিলা	পুং-স্ত্রী পার্থক্য	পুরুষ	মহিলা	পুং-স্ত্রী পার্থক্য
কিউ১	৭২	৫৪	১৮	৭৭	৬৭	১০	৪৬	২৭	১৯	৭৭	৬৫	১২
কিউ২	৭৭	৬৪	১৩	৮৫	৭৯	৬	৫৪	৩৯	১৫	৮৬	৭৮	৮
কিউ৩	৮১	৭১	১১	৮৮	৮৩	৫	৬০	৪৮	১২	৮৯	৮৩	৬
কিউ৪	৮৫	৭৮	৭	৯০	৮৭	৩	৬৮	৫৮	১০	৯২	৮৮	৪
কিউ৫	৯২	৮৭	৫	৯৫	৯৪	১	৮১	৭৬	৫	৯৬	৯৪	২
মোট	**৮৩**	**৭৩**	**১০**	**৮৭**	**৮২**	**৫**	**৬৪**	**৫৩**	**১**	**৮৮**	**৮২**	**৬**
পার্থক্য (কিউ৫ – কিউ১)	২০	৩৩		১৮	২৭		৩৫	৪৯		১৯	২৯	

সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (৬৪তম, ২০০৭ এবং ৭১তম, ২০১৪)

একটি রাজ্য মুসলমান-প্রধান (জম্মু ও কাশ্মীর)। সুতরাং, সার্বিক সাক্ষরতার নিরিখেও যে এই দশটি রাজ্যই পিছিয়ে থাকবে তার মধ্যে কোনও আশ্চর্য হওয়ার মতো ব্যাপার নেই। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই দুই-একটি ইতিবাচক দিক চোখে পড়ছে। প্রথমত, গত এক দশকে (২০০১-২০১১) এই পিছিয়ে পড়া দশটি রাজ্যেই মহিলা সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (প্রায় ১০ শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে) এবং দ্বিতীয়ত, ভারত ওই সময়ের মধ্যে ২১৭ মিলিয়ন সাক্ষর জনসংখ্যাকে সমাজে যুক্ত করেছে, যাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা (১১০ মিলিয়ন) পুরুষদের (১০৭ মিলিয়ন) ছাপিয়ে গেছে।

চিত্র-৮
শতকরা যে ক'টি স্কুলে শিক্ষিকা আছেন

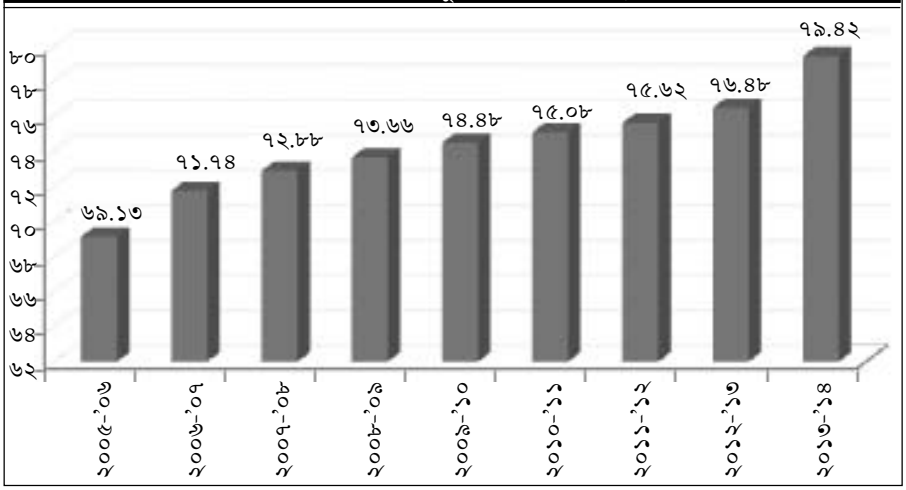

- **লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio) :**

স্কুলগুলোতে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়ানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হলে আগে দরকার জনসংখ্যায় শিশুকন্যাদের হার বৃদ্ধি। স্পষ্ট করে বললে, মেয়েদের আগে তো ভূমিষ্ঠ হতে দিতে হবে, তার পরে আসে পড়াশোনা শেখার প্রশ্ন। ভারত সার্বিক লিঙ্গ অনুপাতে বিশ্বের শেষের কুড়ি দেশের মধ্যে পড়ে। ভারতে লিঙ্গ অনুপাত ১৯০১ সালের ৯৭২ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৫১ সালে ৯৪১ এবং ২০১১ সালে ৯৪০, দাঁড়ায়। অর্থাৎ, তা ২০০১ সালের (৯৩৩) থেকে সামান্য বেশি। সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক তথ্য হল যে, ২০১১ সালে ০-৬ বয়সীদের লিঙ্গ অনুপাত দাঁড়িয়েছে এযাবৎকালীন সবচেয়ে কম (৯১৪)। এর অর্থ হল, ছেলেদের তুলনায় স্কুলে মেয়েদের সংখ্যাটা আগামী দিনে উত্তরোত্তর কমতে থাকবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের দু'টি রাজ্য (মিজোরামে ৯৭১ এবং মেঘালয়ে ৯৭০) ০-৬ বয়সীদের লিঙ্গ অনুপাতের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে

চিত্র-৯
মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গ, জাতপাত ও ধনসম্পদ অনুসারে মোট উপস্থিতির হার

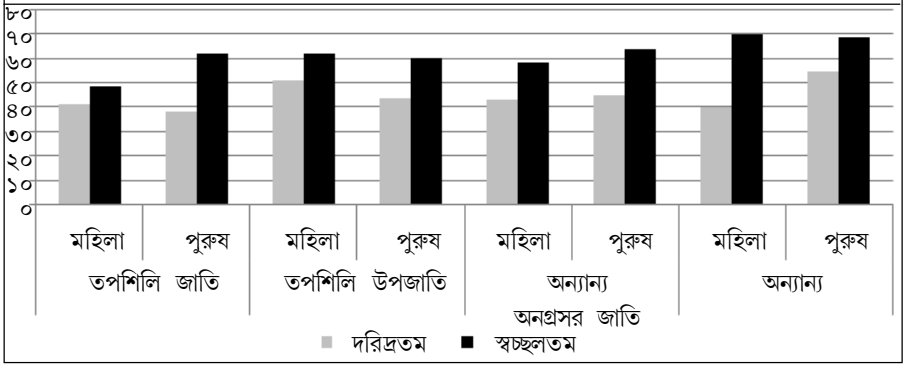

দু'টি তথাকথিত এগিয়ে থাকা রাজ্যে লিঙ্গ অনুপাত দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন (হরিয়ানা ৮৩০ ও পাঞ্জাব ৮৪৬)।

● **স্কুলের গণ্ডির বাইরে মেয়েরা :**

MHRD-র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ, অর্থাৎ, ৬.০১ মিলিয়নেরও বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলের গণ্ডির বাইরেই রয়ে গেছে। একই ধরনের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০০৬ সালে ৭ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ৪.২ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে ছিল। স্কুলের গণ্ডির বাইরে থেকে যাওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেয়েদের হার (৩.২৩ শতাংশ) ছেলেদের (২.৭৭ শতাংশ) তুলনায় বেশি। রাজস্থান (৭.৬ শতাংশ), উত্তরাখণ্ড (৫.২ শতাংশ) এবং উত্তরপ্রদেশে (৪.৬ শতাংশ) স্কুলের বাইরে থেকে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। অন্যদিকে, মিজোরাম, কেরালার মতো রাজ্যগুলিতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক মেয়ে স্কুলের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই রির্পোট অনুযায়ী, গৃহকর্মে সাহায্য করতে তথা ছোটো ভাই-বোনেদের দেখাশোনা করার জন্যই বেশিরভাগ মেয়ে স্কুলে যেয়ে উঠতে পারে না। এই চিত্রটি কিন্তু গ্রাম (৩.৩৬ শতাংশ) ও শহরে (২.৮৬ শতাংশ) খুব একটা আলাদা নয়।

● **স্কুলে মেয়েদের অনুপাত :**

জাতীয় স্তরে নানা রকমের কর্মসূচির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে মেয়েদের অনুপাত মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, সর্বশিক্ষা অভিযান চলাকালীন, ২০০৫-'০৬ সালে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতির হার ৪৫.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮.২ শতাংশ হয়েছে।

২০১৪-'১৫ সালের UDISE-এর তথ্য অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করার অনুপাতে এক বড়োসড়ো ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এই তফাৎটা প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—সব স্তরেই দেখা যায়। তবে উচ্চশিক্ষার যত ওপরের দিকে যাওয়া যায় এই ফারাক ক্রমশ কম হতে থাকে। লক্ষ্য করা দরকার যে, গত দশকে উপরের

চিত্র-১০
মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গ, অবস্থান ও আর্থিক সম্পদ অনুসারে মোট উপস্থিতির হার

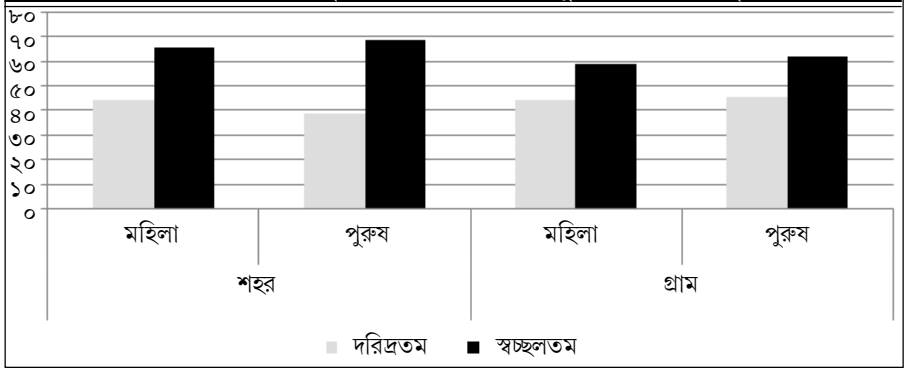

দিকের ক্লাসে মেয়েদের অনুপাত যথেষ্ট বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অষ্টম শ্রেণিতে মেয়েদের অনুপাত ২০০৫-'০৬ সলের শতকরা ৪৬ ভাগ থেকে ২০১৩-'১৪ সালে বেড়ে ৪৯ শতাংশ হয়েছে।

গত কয়েক দশক ধরে মেয়েদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকম কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় ফলস্বরূপ মেয়েদের শিক্ষার এই আনুপাতিক বৃদ্ধি বলে অনুমান করা যেতে পারে।

● **স্কুলছুট :**

স্কুল শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর জন্য নানাবিধ কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপত্র নেওয়া সত্ত্বেও স্কুলছুটের উচ্চ হার এক বড়োসড়ো উদ্বেগের কারণ। MHRD-র ২০১৪ সালের Out of School Children (OOSC) রিপোর্ট অনুযায়ী, স্কুলের গণ্ডির বাইরে থেকে যাওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৩৬.৫ শতাংশ ছেলে ও ৩৭.৫ শতাংশ মেয়ে স্কুলছুট। রিপোর্ট অনুসারে, মেয়েদের স্কুলের বাইরে থেকে যাওয়ার মূল পাঁচটি কারণ হল :

১. দারিদ্র্য/অর্থনৈতিক কারণ (২৩.৯ শতাংশ)।

২. শিশুটির পড়াশোনায় আগ্রহের অভাব (১৭.৫ শতাংশ)।

৩. পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য শিশুটিকে রোজগার করতে হয় (১১.৬ শতাংশ)।

৪. কোনও শারীরিক অক্ষমতা বা দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে শিশুটি ভোগে (১০.৮ শতাংশ)।

৫. গৃহকর্মে সাহায্য করার জন্য (৮.৭ শতাংশ)।

UDISE-র তথ্য ব্যবহার করে বার্ষিক গড় স্কুলছুটের হার হিসাবনিকাশ করলে দেখা যায়, সব স্তরেই ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুট হারে খুব একটা ফারাক নেই। অবশ্য উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটের হার (ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩.১ শতাংশ, মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ) মোটের উপর সবচেয়ে বেশি। কাজেই, এই স্তরেই জোরটা বেশি দেওয়া দরকার। এই স্তরেই পড়ুয়ার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বেড়ে যায়, মেয়েদের শারীরবৃত্তির পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং স্কুলে যাওয়ার সামাজিক স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করারও প্রয়োজন আছে।

স্কুলে মৌলিক পরিকাঠামোর অভাব হেতু মেয়েদের (এবং ছেলেদেরও) স্কুলছুট হওয়া আটকাতে সরকারের উচিত স্কুলগুলিতে ন্যূনতম অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো থাকাটা সুনিশ্চিত করা। সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলগুলিতে RTE আইন-এ তালিকাভুক্ত ন্যূনতম পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে পড়ে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধাগুলো, যেমন—নিরাপদ পানীয় জল, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাতে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক সংখ্যা, খেলার মাঠ, পাঠাগার, র‍্যাম্প ইত্যাদি। এর মধ্যে স্কুলছুট হার কমানোর জন্য মেয়েদের পৃথক শৌচাগার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল স্কুলে শিক্ষিকা আছেন কি না?

চিত্র-১১

দশম শ্রেণিতে পাসের হারের বৈষম্য : লিঙ্গ ও রাজ্য অনুযায়ী

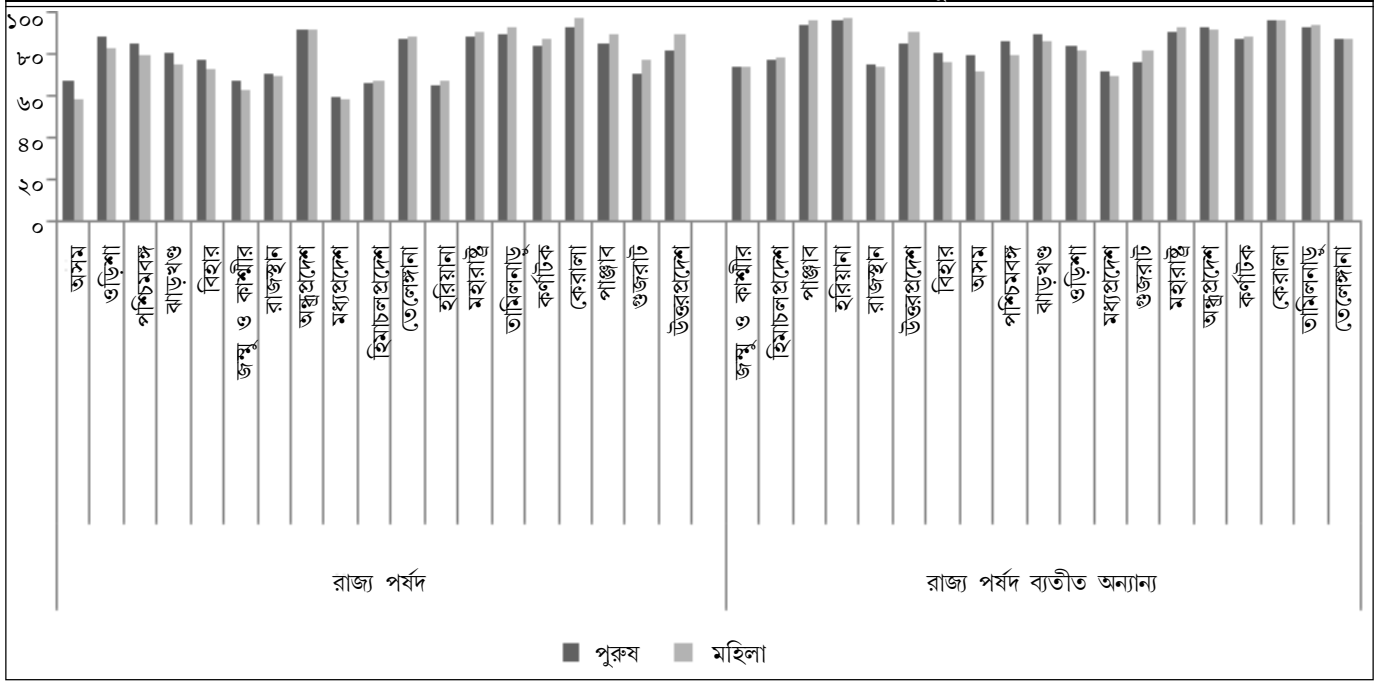

বর্তমান (২০১৪-'১৫) UDISE তথ্য অনুযায়ী, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিকার সংখ্যাটা প্রায় ৪৬.৭ শতাংশ। যাইহোক; আশু প্রয়োজন যেটা, তা হল স্কুলগুলিতে আরও বেশি বেশি করে শিক্ষিকা নিয়োগ। প্রাথমিক স্তরে কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে শিক্ষিকার সংখ্যা অবশ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের মোট উপস্থিতির হারের সঙ্গে ধনসম্পদ ও অসাম্যের মূল কারণগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্র-৯ ও ১০-এ তুলে ধরা হয়েছে। চিত্র-৯ অনুযায়ী, 'অন্যান্য' হিসাবে চিহ্নিত জাতিগোষ্ঠী, যারা বরাবর প্রান্তিক ছিল না, তারা বাকি শ্রেণির তুলনায় অনেকটা ভাল অবস্থায় রয়েছে। আবার চিত্র-১০ অনুযায়ী, শহুরে ছেলেমেয়েরা গ্রামের ছেলেমেয়েদের থেকে ভালো অবস্থায় আছে। দু'টি চিত্রই নির্দেশ করে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় খারাপ অবস্থায় আছে। এই চিত্রগুলি থেকে পরিষ্কার যে, সামাজিক অবস্থান বা কোথায় তারা বাস করছে সেটা নয়, শুধু দারিদ্র্যই পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে, যারা সবচেয়ে গরিব তাদের অবস্থাই স্বচ্ছলদের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রেও সবচেয়ে পিছনের সারিতে। এই বার্তাটি আরও একবার সুস্পষ্ট হচ্ছে চিত্র-১-এ। দেখা যাচ্ছে, স্বচ্ছলতম তপশিলি পরিবারের মেয়েটির যেখানে স্কুলে মোট উপস্থিতির অনুপাত (৮০ দিনের মধ্যে) ৬০-এরও একটু বেশি, সেখানে 'অন্যান্য' হিসাবে চিহ্নিত (অগ্রসর) জাতিভুক্ত দরিদ্রতম পরিবারের মেয়েটির উপস্থিতি ৪০-এর মতো। অর্থাৎ তফাৎটা প্রায় ২০ শতাংশ পয়েন্টের।

"ওড়িশার Girls Incentive Programme (OGIP)-টি যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক-পূর্ব স্তরের স্কলারশিপ (PMS) প্রকল্পটির মাধ্যমে তা রূপায়িত হয়।"

- **স্কুলের পাঠ শেষ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য :** ২ নং সারণি-তে ২০০৭ ও ২০১৪ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১২ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের সম্পদ ও লিঙ্গ অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পরিসংখ্যান তুলে ধরে হয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই উন্নতি বেশ চিত্তাকর্ষক। ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য ১০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ নেমে এসেছে। সমস্ত সম্পদ বিভাগেই (Q_5 থেকে Q_1) এই কমে যাওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ে। যখন সম্পন্ন ও গরিব ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেষ করার বিষয়ে তুলনা করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে বৈষম্য বেশি। ২০১৪ সালে সব থেকে সম্পন্ন ও গরিব ছেলেদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার প্রভেদ যেখানে ১৮ পয়েন্ট, মেয়েদের মধ্যে তা ২৭ পয়েন্ট।

প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চ-প্রাথমিক ছাড়া মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। দশম শ্রেণি পাস করার ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য লিঙ্গ বৈষম্য দেখা

যায়। রাজ্য পর্ষদের দশম শ্রেণির পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অসমে সর্বোচ্চ লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। এই ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এই রাজ্যে মেয়েদের সর্বনিম্ন পাসের হার অনুন্নয়নের বিষয়টিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের উৎসাহব্যঞ্জক যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে NCERT পরিচালিত সর্বশেষ জাতীয় সাফল্য সমীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায়, মেয়েদের শিক্ষণ সাফল্য ছেলেদের থেকে কোনও অংশে কম নয়। ইংরাজি ভাষায় প্রাপ্ত নম্বরে (Mean Score) মেয়েরা (২৫২) ছেলেদের (২৪৮) থেকে এগিয়ে। একইভাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় (MIL) মেয়েদের স্কোর ২৫৪ এবং ছেলেদের ২৪৬। আবার, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যায় ছেলে ও মেয়েদের স্কোর একদম সমান (প্রতিটিতে ২৫০)।

উপসংহার ও কিছু সুপারিশ

এই নিবন্ধে ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হল। তার সঙ্গে কিছু প্রশ্ন, যেমন—ভারতের সাক্ষরতার হারের ধরন কী রকম এবং বর্তমানে এদেশে স্কুল শিক্ষায় অংশগ্রহণের হালহকিকৎ তথা কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, ইত্যাদির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে গত দুই দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতির সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জনগণের গড় শিক্ষালাভের হার বাড়ছে এবং স্কুল শিক্ষায় প্রাথমিক-এর পাঠ শেষ করে মাধ্যমিক স্তরে যোগদান করার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট বাধাবিপত্তি রয়ে গিয়েছে। একটি বিষয়ে নজর দেওয়া খুবই দরকার যে, স্কুল শিক্ষায় যোগ দেওয়ার মোট হার সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রায়শই আড়াল করার চেষ্টা হয়ে থাকে।

(১) সার্বিক হার বৃদ্ধি হলেও যে বয়সে যে ক্লাসে পড়ার কথা মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা অনেক কম।

(২) যারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে, তারাও যতটা সময় লাগা উচিত, তার তুলনায় বেশি সময় লাগাচ্ছে, ফলে 'Opportunity Cost' বা শিক্ষার সুযোগের অপব্যয় বেশি হচ্ছে।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ বড়ো সংখ্যায় মেয়েরা ক্লাস অনুযায়ী হয় বেশি বয়সী বা কমবয়সী হওয়ায় (দেরি করে ভর্তি বা বেশি তাড়াতাড়ি ভর্তি বা একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি করায়), শিক্ষণ পদ্ধতিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৪) স্কুলে নাম নথিভুক্তির হার বৃদ্ধি পেলেও, স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় এখনও বেশ সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এই বিষয়টিই, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে যোগদানকারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে।

এই লেখাতে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, স্কুল শিক্ষায় মোট যোগদানকারীর সংখ্যার বিচারে বৈষম্য কিন্তু অনেকটাই বেশি। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মোট উপস্থিতির হার বেশ কম। সামাজিকভাবে প্রতিকূল অবস্থায় থাকা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি আরও সঙ্গিন। জাতপাত ও অর্থনৈতিক অবস্থা এই বৈষম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলেছে। পড়ুয়াদের যোগদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যের নিরিখে ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন হারটিকে আলাদা করে দেখলে হবে না, তার সাথে সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী, 'অন্যান্য' হিসাবে চিহ্নিত 'জাতিগোষ্ঠী' থেকে আসা মেয়েদের যোগদানের বিষয়টিকেও একত্রিত করে দেখতে হবে।

এছাড়াও কোথায় বসবাস করছে তার ওপর নির্ভর করেও বৈষম্য দেখা যায়। শহরে থাকা মেয়েদের অবস্থা, গ্রামে থাকা মেয়েদের তুলনায় কিছুটা ভালো। মোটামুটিভাবে ছেলেদের তুলনায় সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এটা পরিষ্কার যে, অবস্থাপন্ন তপশিলি জাতি পরিবারের মেয়েদের উপস্থিতির হার অন্যান্য হিসাবে চিহ্নিত (অগ্রসর) গরিব মেয়েদের তুলনায় ২০ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে এবং তা কয়েক বছর ধরেই রয়েছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি বৈষম্যের শিকার। সব থেকে সমস্যার কথা হল স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে টাকা-পয়সার বৈষম্য। মেয়ে শ্রমিকদের সুলভ শ্রমের সুযোগ এবং তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া এখনও গভীর সমস্যা। স্কুলগুলি মেয়েদের জন্য পরিকাঠামোগত, দূরত্ব ও এবিধ নানা কারণে যথেষ্ট উপযুক্ত ও নিরাপদ না হওয়ায় এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। KGBV ও NPEGEL-এর মতো প্রকল্পগুলি সাফল্য পেলেও তার নাগাল পেয়েছে হাতে গোনা কিছু পড়ুয়া। স্কুলে যোগদানের পর মেয়েদের স্কুল শিক্ষা ঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার বিলিব্যবস্থাকে এই প্রতিবন্ধকতা-গুলোকে আশু দূর করতে উদ্যোগ নিতে হবে।

নারী প্রগতিতে শিক্ষার অবদান একমাত্র তখনই বোঝা যাবে, যখন সুযোগ-সুবিধায় সমতা আনার প্রসারে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ও সমমর্যাদা প্রদানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একাধিক কন্যাশিশু কেন্দ্রিক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে একটি আকর্ষণীয় প্রকল্প হল ওড়িশার Girls Incentive Program (2013-2016)। এই প্রকল্পটি রূপায়ণের দু' বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে উপস্থিতির হার ৭৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৪ শতাংশ হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল উপস্থিতি ও শিক্ষার ফলাফলে উন্নতি করা। উপরিলিখিত বিশ্লেষণের মূল বক্তব্য হল সমাজের সম্পন্ন লোকেরাই আগে থেকে যে কোনও ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের হেতু লভ্য সুযোগ-সুবিধা বেশি পেয়ে যায়, তাই লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে আরও গরিবমুখী নীতি প্রণয়ন আশু প্রয়োজন।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখকদ্বয় শৈলেন্দ্র শর্মা ও ড. শশীরঞ্জন ঝা যথাক্রমে 'আইপিই গ্লোবাল'-এর 'এডুকেশান অ্যান্ড স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট'-এ ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার। ইমেল : shalendrasharma@ipeglobal.com, sjha@ipeglobal.com)

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েরা

*ভারতের জাতীয় আন্দোলন অনেক শাখা-প্রশাখা এবং জটিল পর্ব থেকে পর্বান্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধিতার পাশাপাশি অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গটিও। মূল আন্দোলনের একটা দিক ছিল গান্ধীবাদী তথা কংগ্রেসী রাজনীতি-সত্যাগ্রহ-আইন অমান্য ইত্যাদি নরমপন্থী পদক্ষেপ। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল চরমপন্থী আন্দোলন, যা মূলত পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং বাংলার পরিসরে পল্লবিত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিলারা বেশ বড়ো সংখ্যায় সামিল হন। সমাজ সংস্কারের প্রশ্নেও সামনে উঠে এসে নেতৃত্ব দেন তারা। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে এসব মহিলাদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই এসেছিলেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিসর থেকে। তবে বহু দলিত এবং আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণের ইতিহাস এখনও অলিখিত রয়ে গেছে। লিখেছেন—***ড. জ্যোতি অটওয়াল**

ধাপে ধাপে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং জটিল পর্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জনমানসে জাতীয়তাবাদী বিতর্কে সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নটি বরাবরই অনেকখানি জায়গা জুড়ে থেকেছে। সামাজিক এবং জাতীয় প্রশ্নগুলিকে ঘিরে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতাও বিকশিত হতে থাকে যুগপৎ। আইন সংস্কার এবং বিধান সভায় (Imperial Legislative Council) ভারতীয়দের সামিল করার দাবির মাধ্যমেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বের সূচনা। ১৮৮০-র দশক থেকেই এ দেশের মহিলা ও পুরুষ—উভয়েই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র ও বাংলা-সহ গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মহিলার আত্মজীবনী এবং লেখালেখির মধ্যে এই মত জোরালো হয়ে ওঠে যে, সাংসারিক পরিসরে বাড়ির মেয়ে-বৌরা যেসব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা আদতে রাজনৈতিক কারণেরই অন্যপীঠ 'Personal in Political'। সমাজ সংস্কারের মতো পুরুষপ্রধান ক্ষেত্রে মহিলারা প্রবেশ করছেন, এই তথ্যই অতীতের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার তূল্যমূল্য (কোসাম্বি, ২০০৭)।

১৯২০-র দশকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীবাদী আন্দোলনে বহু মহিলা সামিল হন। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এবং তার বাইরের দুনিয়ায় মহিলাদের অবস্থান কী হওয়া উচিত, গান্ধীজী তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা ব্যক্ত করতে সমর্থ হন। ১৯২০-র দশকের শেষের দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন এক সামাজিক ভিত্তি অর্জন করে। বাল্যবিবাহ এবং বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহের মতো বিষয়গুলি একই সাথে গান্ধী এবং স্থানীয় সংস্কারকদের বক্তব্যে উঠে আসতে থাকে। জাতীয়তাবাদীদের কল্পনায় ভবিষ্যতের ভারতীয় জাতির (Indian Nation) যে ছবিটা ইতোমধ্যেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল, তার আধুনিকতার দিকটা এর মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার এবং সামাজিক পরিবর্তনের সৌজন্যে জনতার মধ্যে লেখাপড়া জানা এক নতুন শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই শ্রেণিতে মহিলাদের সংখ্যাটা ছিল নিত্যন্ত নগণ্য। শিক্ষার বিস্তার এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার—এই দুইয়ের সৌজন্যে শিক্ষিত সমাজ প্রভাবিত হতে থাকে। উনিশ শতকে সারা ভারত জুড়ে মহিলাদের অসংখ্য নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯০৮ সালে রোকেয়া শাখাওয়াত হুসেন, বাংলার এক শিক্ষাবিদ তথা গল্পকার লিখলেন, 'সুলতানার স্বপ্ন'। এই ছোটো গল্পটি মহিলাদের নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করায়। বাংলায় মহিলাদের বহু চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী সরলদেবী চৌধুরানী ১৯১০ সালে "ভারত স্ত্রী মহামন্ডল" গড়ে তোলেন। তিনি হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচির মেলবন্ধন ঘটান। হিন্দুদের উৎসব 'অষ্টমী'-কে কিছুটা রদবদল করে চালু করেন 'বীরাষ্টমী'। বীরাষ্টমী পালন করা হতো এ দেশের অতীতের পরাক্রমী বিজয়ী নায়কদের স্মরণের মাধ্যমে।

শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বম্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, বাংলায় মূলত গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ প্রসার লাভ করে। স্বদেশি (প্রচার) অভিযানে অংশ নিতে মেয়েরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের থেকেই উৎসাহ পেতেন। স্বদেশি অভিযানের কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি কাপড় বর্জন এবং মদের দোকানে পিকেটিং। ভারত মাতার সেবক হিসাবে নিবেদিত প্রাণ এক জাতীয়তাবাদী শ্রেণির উদ্ভব হয় বাংলায়। ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) লেখেন 'আনন্দমঠ'। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্ররা বিপ্লবী যোদ্ধা, যারা মাতৃভূমির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর জনপ্রিয়তম স্তোত্র, 'বন্দে মাতরম্' ঔপনিবেশকতা বিরোধী সমস্ত ভারতীয়ের

তথা পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা যাবতীয় সমিতি-সভা-প্রতিষ্ঠানের (মাতৃ) বন্দনা-গীত হয়ে ওঠে।

মহিলাদের অংশগ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ে, 'হোম রুল' এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন (Constitutionalism)-এর ধারণা বেশি প্রাধান্য লাভ করে। এর পেছনে পাশ্চাত্যের কয়েকজন মহিলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ-আইরিশ বংশোদ্ভূত, অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হলেন ১৯১৭ সালে। ব্রহ্মবাদী (Theosophist) এবং সমাজতান্ত্রিক নেত্রী বেসান্ত প্রচারাভিযান চালানোর প্রশিক্ষণ লাভ করেন লন্ডনে। আয়ারল্যান্ড মডেলের ভিত্তিতে তিনি 'হোম রুল'-এর জন্য প্রচারাভিযান শুরু করেন। তাঁর এক সহযোগী, মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনকারী আইরিশ মহিলা মার্গারেট কাজিনস্ (১৮৭৮-১৯৫৪) ভারতীয় মহিলাদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিল (Indian Women's Voting Rights Bill)-এর খসড়া প্রস্তুত করেন। তিনি মহিলাদের জন্য "Women's Indian Association" নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেন। ১৯১৭ সাল নাগাদ সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) একজন প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর দ্বিতীয় মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভের সময় নাইডু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সামিল হন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮, এই চার বছর ধরে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। মহিলাদের জন্য গড়ে তোলা কাজিনস্-এর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে লন্ডনে যে প্রতিনিধি দল যায়, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন নাইডু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং ১৯১৯ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড জাতীয় মানসিকতায় পরিবর্তন আনে; গোটা দেশজুড়ে মানুষ স্বাধীনতার প্রশ্নে এককাট্টা হয়ে ওঠে। এটা ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়। ১৯১৯ সালের শুরুতে ব্রিটিশ প্রশাসন রাওলাট আইন পাস করে। এই আইন বলে জনতার জমায়েত/বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করে নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। সেবছরই ১৩ এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ বা 'সত্যাগ্রহ' এবং অসহযোগ-এর ডাক দেন। পাঞ্জাবের অমৃতসরে বিপুল সংখ্যক মানুষ এক শান্তিপূর্ণ প্রদর্শনে সামিল হন। সংখ্যায় হাজারের উপর এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। ঔপনিবেশিক হিংসার এই দৃষ্টান্ত ১৯২০-'২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়কে সম্ভবপর করে তোলে। আইন-আদালত এবং স্কুল বয়কটের উপর বেশি করে জোর দেওয়া হয় এই আন্দোলন সূচিতে। স্বদেশিদের অ্যাজেন্ডায় তা অগ্রাধিকার পায়। 'রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ'-এর মতো মহিলাদের নিজস্ব সংগঠনগুলি জেলা কংগ্রেস কমিটির সাথে মিশে যায়। বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে অসহযোগ আন্দোলন এবং সারা ভারত জুড়েই মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে সামিল হন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেরও প্রতীক হয়ে ওঠে এই আন্দোলন। আমেদাবাদে, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী, বাই আম্মান ছয় হাজার মহিলার এক বিপুল জমায়েতে পুরুষদের পিকেটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য বক্তব্য রাখেন। সমাজের বিচ্ছিন্ন/প্রান্তিক অংশের থেকেও মহিলারা যাতে এই আন্দোলনে সামিল হন সেজন্য আবেদন করেন গান্ধীজী। অন্ধ্রপ্রদেশে, দুর্গাবাই নামে এক মহিলা গান্ধীজীর বক্তৃতা শোনার জন্য এক হাজারের বেশি দেবদাসী (প্রথাগতভাবে যাদের মন্দির গণিকা বলে গণ্য করা হয়)-কে জড়ো করেন। এরা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার দান হিসাবে সংগ্রহ করেন। এর পর যাদেরকে গান্ধী সবচেয়ে বেশি করে তাঁর আন্দোলনের উপযোগী সহযোদ্ধা হতে পারেন বলে মনে করতেন, তারা ছিলেন হিন্দু ঘরের বিধবা মহিলাদের একটা বড়ো অংশ। এরা সেই গোত্রের মহিলা, সত্যাগ্রহের জন্য যাদের কোনও প্রশিক্ষণের দরকার পড়েনি। গান্ধীর জন্য আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতিভূ ছিলেন এরা। তাঁর আন্দোলনের সবচেয়ে যোগ্য অংশীদার। একজন বিধবা মহিলার ব্যক্তিগত জীবনে যে পরিমাণ আত্মত্যাগ করতেন তা একজন রাজনৈতিক কর্মীর আদর্শ হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই—এমনটাই ছিল গান্ধীর মত। অর্থাৎ, গান্ধী বাস্তবে বিধবা মহিলাদের সরাসরি আন্দোলনে অংশগ্রহণের ডাক দেননি, বৈধব্য জীবনচর্যার আদর্শকে অনুকরণযোগ্য বলে প্রচার করেছিলেন। হিন্দু বৈধব্য জীবনচর্যাকে, রাজনীতিকরণ করে এক আদর্শস্বরূপ জনগণের সামনে পেশ করেন। এক শান্ত অথচ অবিচল সংগ্রামের প্রতি জনগণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এই আদর্শকেই ব্যবহার করেন গান্ধী। সুতরাং, ঔপনিবেশকতা উত্তর ভারতে এক সংগ্রামরত মাতৃ মূর্তি যে দেশের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী অতীত এবং সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ জাতির রূপগ্রহণ করবে, এর পর তা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল (অটওয়াল, ২০১৬)। পরবর্তীতে, কৌমার্য ব্রত পালনের বছরগুলিতে যৌনতা অবদমন ও পরিহার করে নিজের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটান গান্ধী। তাই শুরু থেকেই, তিনি মহিলাদের আত্মত্যাগী মার্গ চেতনার গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে, মাত্রা এবং অঞ্চলভিত্তিক ব্যাপকতার নিরিখে জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ১৯২০-র দশকের পরবর্তী এই রাজনৈতিক বাতাবরণে 'Mother India' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেন ক্যাথরিন মেয়ো নামে একজন মার্কিন মহিলা। দু'বছর ধরে ভারত পরিভ্রমণ করে বইটি লেখেন তিনি। বইতে মেয়ো অত্যন্ত কঠোরভাবে হিন্দু সমাজের পুরুষদের সমালোচনা করেন তথা পরিবারে মেয়েদের স্থান ক্রীতদাসের থেকে উঁচুতে নয় বলেও মতপ্রকাশ করেন। এই ঘটনাক্রমের সবচেয়ে বেশি তাৎপর্য এখানে যে, উনিশ শতক থেকেই 'হিন্দু পরিবার'-এর গণ্ডির মধ্যে ঢুকে পড়ে সংস্কারের ছায়া। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং সংস্কারকরা যে জাতীয়তাবাদী প্রচারাভিযান চালিয়ে আসছিলেন, তার অভিমুখ বদল হয়। সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ বাধ্য হন পরিবারগুলির দিকে নজর

দিয়ে গার্হস্থ্য পরিবেশকে হিংসামুক্ত করতে। মেয়োর বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় গোটা দেশজুড়ে। জাতীয় সম্মান রক্ষার প্রশ্নে তা আপামর ভারতীয় নারী-পুরুষকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলে। ১৯৩০-এর দশকের আর একটি বড়ো মাপের সাফল্য হল আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা। স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদনের উপর কর আরোপের বিরোধিতা করে প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। পরে সাবরমতী নদী থেকে শুরু হয় ২৪ দিনব্যাপী দীর্ঘ পদযাত্রা। মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের এবার শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। যাতে তারা, এইসব পদযাত্রা, বয়কট অভিযান ও প্রভাত ফেরিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

মহিলারা নিজস্ব সমিতিগুলির মধ্যেই আলাদা করে দেশাত্মবোধক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এগুলির নামকরণ করা হয় 'দেশ সেবিকা সংঘ'। মহিলারা কারাবরণ করতে এগিয়ে আসেন। নেতৃত্ব দিতে থাকেন শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায়। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন মহিলা চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিতে যোগদান করেন; এবং/অথবা নির্দিষ্ট কিছু ইংরেজ আধিকারিকের হত্যাকাণ্ডে সামিল বিপ্লবীদের সে কাজে সাহায্য করেন।

১৯৩০-এর দশকে কারাবরণ করেন যেসব মহিলা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল সরোজিনী নাইডু, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি, মার্গারেট কাজিনস্, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। "মুক্তমনা বাড়ি এবং রক্ষণশীল পরিবার, শহুরে কেন্দ্র এবং গ্রামীণ জেলা থেকে; মহিলারা—অবিবাহিত এবং বিবাহিত, যুবতী এবং বয়স্ক নির্বিশেষে এগিয়ে এসে যোগ দেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে" (ফোর্বস, ২০০৫)।

ইংরেজ প্রশাসন নির্বিচারে পুরুষদের কারারুদ্ধ করার কারণে, মহিলা সমিতিগুলি আইন অমান্যের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার এবং সভা-সমিতি আয়োজনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। এর সাথে সাথে তাঁরা কাপড় বোনার মতো গান্ধীবাদী গঠনমূলক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন। অনশনের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রতিরোধের রাস্তায় হাঁটেন। ১৯৩০-এর দশকের সাথে যুক্ত করা যায়, এরকম বেশ কিছু মহিলার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। এদের কাউকে 'সেবিকা' কাউকে 'স্কাউট' বলা হতো। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৩০-এর দশকে, লখনৌতে কংগ্রেস-কে অবৈধ বলে ঘোষণা করে সরকার। নিজের স্মৃতিকথায়, প্রখ্যাত হিন্দি উপন্যাসিক প্রেমচন্দের স্ত্রী শিবরানি দেবী লেখেন, পুলিশের লরিতে বসা মাত্র মহিলারা মহাত্মা গান্ধীর নামে এবং 'ভারত মাতা কি জয়' বলে জয়ধ্বনি করতে থাকেন। তাঁরা সেসময় ছিলেন সাকূল্যে সাত জন। এদিকে একজন ইন্সপেক্টর-সহ সাত জন কনস্টেবল। সব মহিলা জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে চলেছেন.....যখন ইন্সপেক্টর নেমে গেলেন, দেখলেন ঠিক তাঁদের পাশে বসা কনস্টেবলের চোখে জল। শিবরানিকে গ্রেপ্তার করার আগে, ওই ইন্সপেক্টর আরও প্রায় ৫০ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন বটে কিন্তু জেলে নিয়ে যাননি। শহর থেকে দূরে কোনও অচেনা জায়গায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। 'মহিলা আশ্রম'-এর একটি প্রকাশ্য জনসভায় প্রায় ১২ হাজারের বেশি মানুষ জমায়েত হন। খুব ভালো করেই জানতেন যে তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন—তা সত্ত্বেও সেই জমায়েতে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন শিবরানি। ১৯৩১ সালের নভেম্বরে বিদেশি কাপড় পিকেটিং-এর জন্য আরও সাত মহিলা সহযোগীর সাথে ফের একবার গ্রেপ্তার বরণ করেন শিবরানি (অটওয়াল, ২০০৭)। তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ দেশের মেয়েদের মধ্যে একবার জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে ওঠার পর তা ক্রমশ পল্লবিত হতে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হাসিল করার জন্য তাঁরা বিবিধ উপায়/পথের সন্ধান শুরু করেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশভক্ত সংগঠন, হিন্দুস্তান সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রী সমিতি (Hindustan Socialist Republican Association)-তে অবদান রাখেন দুর্গাবতী দেবী ওরফে দুর্গা ভাবী (১৯০৭-১৯৯৯)। দুর্গাবতী ও তার স্বামী ভগবতী চরণ ভোরা, উভয়েই এই সমিতির সদস্য ছিলেন। সন্ডার্সকে হত্যার পর ছদ্মবেশ ধারণ করে ট্রেনে চেপে পালাতে থাকেন ভগৎ সিং। সেই যাত্রায় তার সঙ্গী হয়েছিলেন এই দুর্গা ভাবী।

১৯৩০-এর দশকে চরমপন্থী আন্দোলনে মেয়েদের বৈপ্লবিক অংশগ্রহণের আর একটি দৃষ্টান্ত চট্টগ্রামে স্বশস্ত্র অভ্যুত্থান। কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫), পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট নেত্রী কল্পনা যোশী, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনী (Indian Republican Army)-র চট্টগ্রাম শাখায় যোগ দেন ১৯৩১ সালের মে মাসে। এই স্বশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন মাস্টারদা সূর্য সেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সঙ্গে কল্পনারও ১৯৩১ সালের চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনায় সামিল হওয়ার কথা ছিল। আক্রমণের এক সপ্তাহ আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন কল্পনা। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর আত্মগোপন করেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ তাঁদের গুপ্ত ঘাঁটি ঘিরে ফেলে। সূর্য সেন গ্রেপ্তার হলেও, কল্পনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। চট্টগ্রাম স্বশস্ত্র অভ্যুত্থান কেস-এর দ্বিতীয় অতিরিক্ত শুনানির সময় কল্পনাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে মুক্ত হন তিনি।

১৯৩০-এর দশকে গান্ধীবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে লবণ সত্যাগ্রহের বড়ো মাপের নেত্রী হিসাবে উঠে আসেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯৮৮)। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে, তিনি ক্রমশ ভারতীয় হস্তশিল্প, হস্তাচালিত তাঁতশিল্প এবং থিয়েটারের প্রচার-প্রসারের দিকে মনোনিবেশ করেন। গান্ধী, নেহরু এবং সমাজবাদী নেতৃত্ব—এই 'ত্রিকোণ সম্পর্ক' বজায় রাখার কারণে কমলাদেবী কখনই কংগ্রেস-এর সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি। স্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার প্রথমে তাকে পদ্মভূষণ এবং ১৯৮৭ সালে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান, পদ্মবিভূষণ প্রদান করে। গোষ্ঠী নেতৃত্ব (Community Leadership)-এর জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি রামন

ম্যাগসেসাই পুরস্কার পান। দেশের সাংস্কৃতিক জগতে অবদানের জন্যও তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পান। এর মধ্যে রয়েছে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির সর্বোচ্চ সম্মান, 'রত্ন সদস্য'। সংগীত, নৃত্য এবং নাটকের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ পীঠস্থান; National Academy of Music, Dance and Drama-এর সারা জীবনের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'Lifetime achievement' সম্মান পান ১৯৭৪ সালে।

অন্যদিকে, সরোজিনী নাইডু অনেক বেশি রাজনৈতিক পরিসর পান। ১৯২৫ সালে কানপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নাইডু। ১৯২৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব আফ্রিকান ভারতীয় কংগ্রেস-এও সভাপতিত্ব করেন তিনি। ভারতে প্লেগ মহামারীর সময় তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ পদক দেয়।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময়, দর্শনা অঞ্চলে যেসব লবণ কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তাঁদের অন্যতম মুখ ছিলেন সরোজিনী। দর্শনায় ব্রিটিশ প্রশাসনের নির্দেশে সিপাহিরা সত্যাগ্রহীদের মারধোর করে। ১৯৩১ সালে নাইডু গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন গান্ধী এবং মদনমোহন মালব্যের সাথে। আইন অমান্য আন্দোলনে এগিয়ে এসে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধী এবং অন্যান্য বিশিষ্টদের সাথে কারাবরণ করেন নাইডু। ফের একবার, ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন তিনি। স্বাধীনতার পর, আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল মনোনীত হন নাইডু। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি।

আর একজন জাতীয় নেত্রী, অরুণা আসফ আলি (১৯০৯-১৯৯৬), কংগ্রেস-এর মধ্যে এবং তার বাইরেও অত্যন্ত সম্মানীয় জায়গা দখল করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বম্বের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এ পতাকা উত্তোলনের জন্যই তাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়। স্বাধীন ভারতে, ১৯৫৮ সালে তাকে দিল্লির প্রথম মেয়র হিসাবে নিয়োগ করা হয়। মৃত্যুর এক বছর পর, ১৯৯৭ সালে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান, ভারতরত্ন (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হয় তাঁকে। আসফ আলি-কে বিয়ে করার পর অরুণা কংগ্রেস দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। লবণ সত্যাগ্রহের সময় সাধারণ মানুষের মিছিলে অংশ নেন। তিনি একজন ভবঘুরে এই অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত মেনে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্ত করার উদ্যোগের পরও তাকে জেলেই থাকতে হয়েছিল। অন্যান্য মহিলা সহ-বন্দিরা, তাঁকে ছাড়া না হলে জেলের চৌহদ্দির বাইরে পা রাখতে রাজি না হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হস্তক্ষেপের পর বন্দিদশা ঘোচে অরুণার। এক বিপুল জন বিক্ষোভের দরুনই তাঁর মুক্তি সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩২ সালে তাঁকে ফের গ্রেপ্তার করে তিহাড় জেলে পাঠনো হলে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে অনশন করতে শুরু করেন অরুণা। তাঁর এই উদ্যোগের ফলস্বরূপই তিহাড় জেলে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়। তবে অরুণাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আম্বালা জেলে, সহ-বন্দিদের থেকে পৃথক করে একটি জেল কুঠুরিতে একা রাখা হয়। কারামুক্তির পর অরুণা তত বেশি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। ১৯৪২ সালের ৪ আগস্ট তারিখে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বম্বে অধিবেশনে ভারত ছাড়ো প্রস্তাব পাস করে।

পরিশেষে বলতে হয়, জাতীয় আন্দোলনে এ দেশের বহু সংখ্যক মহিলার অংশগ্রহণ ইতিহাসের গবেষকদের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল হিসাবে, জাতীয়তাবাদের প্রচারাভিযানে সামিল নেত্রীদের অধিকাংশই এসেছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। কিন্তু বহু দলিত এবং আদিবাসী মহিলাদের জাতির ইতিহাসে অংশগ্রহণ/অবদানের কাহিনী সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সামনে উঠে এসেছে। এরকম বহু ইতিহাস এখনও অলিখিতই রয়ে গেছে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লির সহযোগী অধ্যাপক। ইমেল : jyoti_atwal@mail.jnu.ac.in)

উল্লেখপঞ্জী :

Radha Kumar, *The History of Doing : An Illustrated Account of Movements for Women's Rights, 1800-1990,* Delhi : Kali for Women, 1993.
Meera Kosambi, *Crossing Thresholds : Feminist Essays in Social History,* Delhi : Permanent Black, 2007.
Geraldine Forbes, 'The Politics of Respectability : Indian Women and the Indian National Congress', in *Women in Colonial India : Essays in Politics, Medicine and Historiography,* Delhi : Chronicle Books, 2005, pp. 11-62.
Mrinalini Sinha, *Specters of Mother India,* Durham and London : Duke University Press, 2006.
Jyoti Atwal, 'Revisting Premchand : Shivrani Devi on Companionship, Reformism and Nation', *Economic and Political Weekly,* vol. 42, No. 8, May 5-11 2007, pp. 1631-7. .....*Real and Imagined Widows : Gender Relations in Colonical North India,* Delhi : Primus, 2016.

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

ঋণ-নীতির সেকাল-একাল

*গত আট আগস্ট তারিখে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন তার কার্যকালের শেষ ঋণ-নীতি বা আর্থিক নীতিটি পেশ করেন। শিল্পমহলকে হতাশ করে এই আর্থিক নীতিতে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখেন রাজন। কোনও পরিবর্তন না আনা সত্ত্বেও এবারের ঋণ-নীতি কিন্তু একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ ব্যাংকের এই আর্থিক নীতি পেশের পরই অবসান ঘটছে এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের। এতদিন পর্যন্ত সুদের হার সংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে শেষ কথা বলতেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। এই প্রথার অবসান ঘটাবে এবার থেকে ছয় সদস্যের এক 'মনিটারি পলিসি কমিটি'। নতুন যুগের সেই ঋণ-নীতি চেহারা প্রত্যক্ষ করতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত। তার আগে পেছনে ফিরে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নীতি বলতে ঠিক কী বোঝায়, তথা কীভাবে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতির মাধ্যমে দেশে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে। লিখেছেন—*****অনিন্দ্য ভুক্ত**

আধুনিক অর্থনীতিতে টাকার জোগানের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান ঋণ-অর্থ। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয় আমানতগুলিতে জনসাধারণ যে অর্থ জমা রাখে তার সমষ্টিই ঋণ-অর্থের প্রধান উৎস। এই অর্থই ঋণ-অর্থ কেননা এই সঞ্চিত অর্থের মোট পরিমাণের ভিত্তিতেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণ দেয়। আর এই ঋণের টাকা যেহেতু লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় সেহেতু এই অর্থ ঋণ-অর্থ। কোনও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমাদের দেশে যেমন রিজার্ভ ব্যাংক, এই ঋণ-অর্থের ভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মোট অর্থের পরিমাণটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে নীতির ভিত্তিতে এই কাজটি করা হয় তাকে বলা হয় ঋণ-নীতি বা আর্থিক নীতি।

এক

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য, প্রাথমিকভাবে দেশে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থের অব্যাহত জোগান প্রয়োজন দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রটিতে। কিন্তু সেই প্রয়োজনও সবসময় সমান নয়, অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা সময় বিশেষে কমা-বাড়া করে। আমাদের মতো কৃষিনির্ভর দেশের কথাই যদি ধরা যায়, অর্থের চাহিদা বাড়ে ব্যস্ত মরশুমে, চাষের সময়। অন্য সময়, শুখা মরশুমে তা কমে যায়। উৎপাদন ক্ষেত্র যদি প্রয়োজনের সময় টাকা না পায় তাহলে উৎপাদন মার খায়, কর্মসংস্থান কমে, প্রয়োজন মাফিক জোগানের অভাবে দামস্তর বাড়ে। আবার যদি উলটো ব্যাপার হয়, যদি প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পায় বা অপ্রয়োজনের সময় টাকার জোগান বাড়ে, তাহলে যেটা হয়, চাহিদার তুলনায় টাকা বেশি হওয়ার দরুন দামস্তর ক্রমাগত চড়তে থাকে। দেশে উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখতে এবং দামস্ফীতির হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাই একান্ত জরুরি।

আগেই বলা হয়েছে, কোনও দেশে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণের কাজটি করে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমাদের যেমন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে নীতির সাহায্যে তার নাম আর্থিক নীতি। কীভাবে এই নিয়ন্ত্রণের কাজটি চলে তা বুঝতে গেলে আগে বোঝা দরকার অর্থ কাকে বলে বা অর্থের জোগান বলতে কী বোঝায়।

অর্থ হল বিনিময়ের মাধ্যম। তবে অর্থের জোগানের ধারণাটি সব দেশে এক রকম নয়। কেন নয়, সেটাও অতএব বোঝা দরকার। অর্থ হল বিনিময়ের মাধ্যম, মানে যার মাধ্যমে কেনাবেচার কাজটি চালানো হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আজকাল আমরা শুধু টাকাকড়ির মাধ্যমেই কেনাবেচা করি না, চেক, ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডও আজ আমাদের লেনদেনের হাতিয়ার। অতএব এগুলিও বিনিময়ের মাধ্যম, অর্থ। টাকাকড়ি হল দেশের আইন-স্বীকৃত অর্থ। আর বাকি যেগুলি, সেগুলি ঐচ্ছিক অর্থ। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হল এই যে আইন-স্বীকৃত অর্থগুলি যে কোনও লেনদেনে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক অর্থগুলি নয়। চেকের মাধ্যমে কোনও জিনিসের দাম দিতে চাইলে বিক্রেতা তা নিতে অস্বীকারও করতে পারে।

বিভিন্ন দেশে অর্থের জোগানের ধারণাটি পালটে পালটে যায় এই ঐচ্ছিক অর্থের কারণে। কোনগুলিকে ঐচ্ছিক অর্থ বলা হবে, কোনগুলিকে নয়, তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশেই যেমন অর্থের চার রকম ধারণার কথা বলা হয়েছে। তবে অর্থের এইসব সংজ্ঞা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে ঐচ্ছিক অর্থ বলতে আমরা কেবল আমানতি অর্থগুলিকেই ধরব। আমানত বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে জমা থাকা চাহিদা ও সঞ্চয় আমানতের অর্থকেই গণ্য করা হবে। এই অর্থকে যে ঋণ-অর্থ বলে সেকথাও আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর্থিক নীতির মাধ্যমে অর্থের জোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই ঐচ্ছিক অর্থটিকে নিয়ন্ত্রণ করেই। নিয়ন্ত্রণের অনেক রকম হাতিয়ার

আছে। এগুলি হল ব্যাংক হার, খোলাবাজারি কার্যকলাপ, পরিবর্তনশীল জমা অনুপাত, রেপো ও বিপরীত রেপো হার, নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক প্রণোদন। ঠিক কীভাবে এই হাতিয়ারগুলিকে ব্যবহার করা হয় সে আলোচনার জায়গা এটি নয়। তবে ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য ব্যাংকিং কাঠামো সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা থাকা দরকার।

ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার একেবারে শীর্ষে আছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। রিজার্ভ ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে পরিমাণ অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে, তার একটা শতকরা ভাগ যেমন রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ হিসেবে জমা রাখতে হয়, তেমনই সংগৃহীত আমানতের উপর কী হারে সুদ দিতে পারবে, ঋণ দেবার ক্ষেত্রে সুদের হারই বা কী হবে, এই সবই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাংক। ফলে সংগৃহীত আমানতি অর্থের ভিত্তিতে কতটা কী ঋণ-অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তৈরি করতে পারবে তাও খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও বোধগম্য হবে। ২০১৫ সালে আমাদের নগদ জমা অনুপাতটি ছিল ৪ শতাংশ। এর অর্থ কোনও ব্যাংক মোট সংগৃহীত আমানতের ৪ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নামে জমা রাখার পরই বাকি টাকা ঋণ দেবার কাজে লাগাতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই জমা অনুপাতটির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক বাজারে ঋণ-অর্থের জোগান কমাতে পারে, অথবা তা কমিয়ে ঋণ-অর্থের জোগান বাড়াতে পারে। যে হাতিয়ারই রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবহার করুক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু থাকে এটিই—বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

দুই

১৯৫১ সালে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ হয়ে ওঠে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। সদ্য স্বাধীন দেশটির প্রয়োজন তখন নানাবিধ। সর্বাধিক প্রয়োজন উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের যথাসম্ভব দ্রুত বৃদ্ধি। আর এই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের জোগান বৃদ্ধি। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক নীতিটি তাই ছিল শিথিল প্রকৃতির। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু থেকেই ভারতীয় অর্থনীতি প্রবল দামস্ফীতির সামনে পড়ে যায়। এই সময় থেকেই তাই রিজার্ভ ব্যাংক 'নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ'-এর নীতি গ্রহণ করে। নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের এই নীতির মূল কথা হল অর্থনীতির বৃদ্ধির প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া হবে, তবে তা যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে, দেখেশুনে, যাতে অর্থের জোগান বৃদ্ধি কোনওভাবেই দামস্ফীতির সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে না তোলে।

"ব্যাংক হার বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদান প্রক্রিয়াটিতে যেমন লাগাম পরানো যায়নি, তেমনই নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি দামস্ফীতির হারটিকে। ১৯৯১ সালে আর্থনীতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেবার পর প্রথমে ব্যাংক হারকে ধীরে ধীরে কমানো হতে থাকে এবং এক সময় কর্যত তাকে বাতিলই করে দেওয়া হয়। ২০১১-১২ সালের আর্থিক নীতিতে রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে দেয় অতঃপর একটি সুদের হারের উপরই নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণের কাজকর্ম চলবে। এই হারটি পরিচিত রেপো হার হিসেবে।"

তবে 'নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ'-এর এই নীতিও বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেনি রিজার্ভ ব্যাংক। ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকেই দামস্ফীতি লাগামছেঁড়া হয়ে উঠতে শুরু করে। অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনের অজুহাতে ঘাটতি ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান অংকটি দেশে দামস্ফীতির একটি প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করছিলই। সেই সম্ভাবনায় ঘৃতাহুতি পড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের আচমকা দাম বৃদ্ধিতে। অস্বাভাবিক দামস্ফীতির এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের রাস্তা ছেড়ে কঠোর ঋণ নিয়ন্ত্রণের রাস্তা ধরতে বাধ্য হয়। ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে ব্যাংক হার। বাড়াতে বাড়াতে ১৯৮১ সালে এই হারকে ১০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাংক হার বাড়িয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হচ্ছে এই যে এর মাধ্যমে অনেক দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

ব্যাংক হার হচ্ছে সেই সুদের হার যে হারে রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক বাংকগুলির ঋণপত্র বাট্টা করে দেয়। রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়মানুসারেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে তাদের মোট সম্পদের একটা অংশ ঋণপত্রের আকারে মজুত রাখতে হয়। ঋণের চাহিদা অর্থনীতিতে বাড়লে এবং রিজার্ভ ব্যাংক সেই চাহিদা পূরণ সঙ্গত মনে করলে ব্যাংক হার অনুযায়ী সেইসব ঋণপত্র ভাঙিয়ে দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তখন ঋণদানের জন্য যতটা নগদ অর্থ তাদের প্রয়োজন সেই পরিমাণ ঋণপত্র ভাঙিয়ে নেয়। এই কারণে ব্যস্ত মরশুমগুলিতে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংক হার কমিয়ে দেয় এবং শুখা মরশুমে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে এইভাবে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ তখনই সম্ভব যখন ব্যাংকগুলির হাতে একদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণপত্র থাকবে এবং অন্যদিকে বাড়তি নগদ অর্থ বিশেষ কিছু থাকবে না। এই দু'টি শর্তের কোনটিই কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায় না। প্রথমত, ভারতে ঋণপত্রের বাজারটি এখনও খুব সুগঠিত না হওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ ঋণপত্র ব্যাংকগুলির হাতে থাকে না। দ্বিতীয়ত, ঋণ দেবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ধার নেবার প্রয়োজন সাধারণভাবে ব্যাংকগুলির পড়ে না তাদের আর্থিক সঙ্গতির কারণেই।

এই কারণেই ব্যাংক হার বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদান প্রক্রিয়াটিতে যেমন লাগাম পরানো যায়নি, তেমনই নিয়ন্ত্রণ করা

যায়নি দামস্ফীতির হারটিকে। ১৯৯১ সালে আর্থনীতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেবার পর প্রথমে ব্যাংক হারকে ধীরে ধীরে কমানো হতে থাকে এবং এক সময় কর্যত তাকে বাতিলই করে দেওয়া হয়। ২০১১-১২ সালের আর্থিক নীতিতে রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে দেয় অতঃপর একটি সুদের হারের উপরই নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণের কাজকর্ম চলবে। এই হারটি পরিচিত রেপো হার হিসেবে।

রেপো রেট হল রিপারচেজ রেট বা পুনঃক্রয় হারের সংক্ষিপ্ত রূপ। রেপো হারের উলটোটি হল রিভার্স রেপো রেট, বিপরীত রেপো হার। বাজারে যখন ঋণের চাহিদা বাড়ে তখন রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাত থেকে সেগুলি কিনে নেয়। চুক্তি হয় যে নির্দিষ্ট সময় পরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তা পুনঃক্রয় করে নেবে। পুনঃক্রয়ের সময় ব্যাংকগুলিকে অবশ্য দাম দিতে হয় কিছুটা বেশি। এই যে বাড়তি দাম, সেটা কতটা বাড়তি হবে তা ঠিক করে দেয় রেপো হার। বাজারে ঋণের জোগান বাড়াতে হলে রিজার্ভ ব্যাংক রেপো হার কমিয়ে দেবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তখন বেশি করে ঋণপত্র বিক্রি করবে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে। বাজারে নগদ অর্থের জোগান বাড়বে। রেপো রেট বৃদ্ধির সঙ্গে তাই দামস্ফীতির হার বৃদ্ধির একটা সম্ভাবনা জড়িয়ে থাকে।

তিন

আগস্ট মাসের আট তারিখে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন তাঁর শেষ আর্থিক নীতিটি পেশ করেছেন। এবং শিল্পমহলকে হতাশ করে অপরিবর্তিত রেখেছেন রেপো হারটিকে। শিল্পমহল হতাশ হলেও রাজনের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা প্রমাণ করে দিয়েছে তার ঠিক চারদিন পরে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রকাশিত দামস্ফীতির হার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুচরো দাম বৃদ্ধির হারটি ৬.০৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে, গত বাইশ মাসের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ। যে গভর্নর বারবার দামস্ফীতির হারকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন, তাঁর কাছে এমন আর্থিক নীতিই অতএব প্রত্যাশিত ছিল।

"২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিজার্ভ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক। এই চুক্তি অনুযায়ী খুচরো দামস্ফীতির হারটিকে সর্বনিম্ন ২ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখার কথা হয়। যে দামস্ফীতির হারটি বর্তমানে ৬.০৭ শতাংশে পৌঁছেছে, গত জুন মাসেই সেটি ৫.৭৭ শতাংশের অংককে ছুঁয়েছিল, যা কিনা সর্বোচ্চ নির্ধারিত ৬ শতাংশের কাছেই। সুতরাং রেপো হার না কমানোই যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।"

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিজার্ভ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক। এই চুক্তি অনুযায়ী খুচরো দামস্ফীতির হারটিকে সর্বনিম্ন ২ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখার কথা হয়। যে দামস্ফীতির হারটি বর্তমানে ৬.০৭ শতাংশে পৌঁছেছে, গত জুন মাসেই সেটি ৫.৭৭ শতাংশের অংককে ছুঁয়েছিল, যা কিনা সর্বোচ্চ নির্ধারিত ৬ শতাংশের কাছেই। সুতরাং রেপো হার না কমানোই যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।

জনমোহিনী নীতির দাবির কাছে মাথা নত না করে একটি যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েই অতএব যাচ্ছেন রঘুরাম রাজন। যাচ্ছেন একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যের অবসান ঘটিয়েই। এতদিন পর্যন্ত সুদের হার সংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে শেষ কথা বলতেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। এই প্রথার অবসান ঘটাবে এবার ছয় সদস্যের একটি 'মনিটারি পলিসি কমিটি'। নতুন যুগের ঋণনীতি কেমন হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অক্টোবর পর্যন্ত।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।)

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

বয়নশিল্প

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to ______________________________ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. ______________________________ Date ____________________

Name (in block letters) ____________________

Category Student / Academician / Institution / Others

Address ______________________________

____

PIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Phone ______________________________

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

To advertise in Yojana (Bengali), contact
(033) 2248-2576/6696

যোজনা (বাংলা) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে
(০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬/৬৬৯৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় জরুরি দু'-চার কথা

বর্তমানে ডেঙ্গু একটি বড়োসড়ো জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেঙ্গু জ্বর 'ফ্লু'-এর মতো আপনা থেকেই কিছুদিনের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যাওয়া রোগ। কিন্তু ঠিক সময়ে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারও হতে পারে, যাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের কোনও প্রতিষেধক বা সারানোর কোনও ওষুধ নেই। কেবল এই রোগের সংক্রমণ রোধ করেই ডেঙ্গুর হতে থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। বর্তমান নিবন্ধে ডেঙ্গু রোগের কারণ, বাহক, প্রবৃত্তি তথা ডেঙ্গু হলে কী করা উচিত বা উচিত নয়—তা নিয়ে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি কীভাবে নিজেরা সচেতন হবে সাধারণ মানুষই এ রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে পারে তাও নির্দিষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।
লিখেছেন—**ডা. ডি মাঝি ও ডা. ডি রায়**

বর্তমানে ডেঙ্গু একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ ডেঙ্গু মোকাবিলায় বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই এই রোগটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের এই বিষয়ে কিছু ধারণা থাকা জরুরি।

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস-ঘটিত রোগ—যেটি স্ত্রী এডিস ঈজিপ্টি মশা দ্বারা বাহিত হয় (কখনও কখনও এডিস অ্যালবোপিক্টাস মশা দ্বারাও ডেঙ্গু রোগ হতে পারে)। দেখা গিয়েছে গোটা বিশ্বে প্রতি বছর ১০০ মিলিয়নের ওপর মানুষের ডেঙ্গু রোগ হয়ে থাকে। ভারতের শহর এবং শহরতলি অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকেও ডেঙ্গু মহামারীর খবর পাওয়া যায়।

ডেঙ্গু জ্বর—'ফ্লু'-এর মতো আপনা থেকেই কিছুদিনের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যাওয়া রোগ। কিন্তু ঠিক সময়ে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে এই রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারও হতে পারে, যাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সংক্রামিত এডিস মশার কামড়ের ৩ থেকে ১৪ দিনের মাথায় (সাধারণত ৪ থেকে ৭ দিন) মানবদেহে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগ ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সেই হয়ে থাকে। ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার মহামারীর সময় সাধারণত শিশুদের বেশি মৃত্যু দেখা যায়।

এডিস মশা যখন কোনও ডেঙ্গু রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন ডেঙ্গু ভাইরাস মশার দেহে প্রবেশ করে এবং এই সংক্রামিত মশা যখন সুস্থ মানুষকে কামড়ায়, তখন সেই মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এই বাহক এডিস মশা ছাড়া মানুষ থেকে মানুষের দেহে ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটে না। ডেঙ্গু সংক্রামিত ব্যক্তি তার অসুস্থতার ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে মশার দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এই ভাইরাস পরবর্তী সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হতে মশার শরীরে ৭ থেকে ৮ দিন সময় নেয়।

ডেঙ্গু রোগে মূলত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায় :

১) হঠাৎ মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রায় জ্বর;

২) মাথায় যন্ত্রণা, কোমরের যন্ত্রণা;

৩) মাংসপেশীতে ব্যথা এবং গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা;

৪) প্রচণ্ড দুর্বলতা, বমি বা বমি-বমি ভাব এবং পাতলা পায়খানা;

৫) চোখের কোটরে যন্ত্রণা এবং চোখ ঘোরাতে ব্যথা;

৬) ক্ষুধামান্দ্য ও স্বাদহীনতা;

৭) বুকে ও হাতে হামের মতো গুটি বের হওয়া; এবং

৮) রক্তক্ষরণ—চামড়ার তলায়, নাক থেকে, মাড়ি থেকে ইত্যাদি।

ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারে ২ থেকে ৭ দিনের জ্বরের সঙ্গে সাধারণ ডেঙ্গুর লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে চামড়ার তলায় রক্তক্ষরণ, নাক ও মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ এবং শরীরের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে। এই সময় রক্তনালীর অবস্থা এমন হয় যে রক্তের তরল অংশ রক্তনালী থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে। এই অবস্থা তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা না করলে রক্ত চলাচলের অবনতি এবং তার থেকে শক্ (shock), এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, এই অবস্থার নাম ডেঙ্গু শক্ সিনড্রোম।

ডেঙ্গু রোগের কোনও নির্দিষ্ট প্রতিকারক ওষুধ নেই। তাই ডেঙ্গু সন্দেহভাজন রোগীর যন্ত্রণা এবং জ্বর নিবারণের জন্য প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ওষুধ খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন—ব্রুফেন বা অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ কোনওমতেই খাওয়া উচিৎ নয়। এই সময় প্রচুর জলপান, বিশ্রাম এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। যদি সত্বর ডাক্তারি পরীক্ষায় ডেঙ্গু হেমারেজির ফিভার ধরা পড়ে, সেই ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে 'ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি'র মাধ্যমে চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ডেঙ্গু ভাইরাস ৪ ধরনের, যথা—ডেন ১, ডেন ২, ডেন ৩ এবং ডেন ৪। যে

কোনও একটিতে সংক্রামিত হলে সারা জীবনের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা সেই ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু অন্য ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং দ্বিতীয়বার অন্য ধরনের এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ঘটলে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক্ সিনড্রোম হওয়ার প্রবণতা প্রবলতর হয়।

বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রতিষেধকের পরীক্ষা চলছে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কিছু ডেঙ্গু অধ্যুষিত রাষ্ট্রে। এটি ৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সের জন্য নির্ধারিত, যদিও এটি সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ নয়। যতদূর জানা গেছে, এই প্রতিষেধক ৬০ শতাংশ কার্যকরী। যেমন—ডেন ৩ ও ডেন ৪-এর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। ডেন ১-এর ক্ষেত্রে মাঝামাঝি ও ডেন ২-এর ক্ষেত্রে খুব কমই কার্যকরী।

ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা দেখতে ছোট (৫ মিলিমিটার), কালো রং, গায়ে ও গাঁটে সাদা সাদা বিন্দু থাকে। এই মশা প্রধানত দিনের বেলায় কামড়ায়, যদিও রোদ ওঠার ২ ঘণ্টা পর্যন্ত আর বিকাল ও গোধূলিবেলায় কামড়ানোর প্রবণতা বেশি থাকে। এই মশা বাড়ির ভিতরে ও আশেপাশে মানুষকে কামড়ায় এবং বাড়ির ভিতরে অন্ধকার কোণে বা কোনও ঝুলন্ত বস্তু, যেমন—জামাকাপড়, ছাতা এবং আসবাবপত্রের নিচে বা পিছনে বিশ্রাম নেয়। এই মশার বারংবার কামড়ানোর প্রবণতা থাকে। কোনও পাত্রের সামান্য জমা জলেও এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি বিনাজলে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে ও জল পেলে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। এডিস মশা সাধারণত যেখানে বৃষ্টির জল জমা হয় বা যেখানে জল জমা থাকে, যেমন—কুলার, ড্রাম, জার, পাত্র, বালতি, ফুলদানি, টবের নিচে রাখা প্লেট, ট্যাঙ্ক, বোতল, টায়ার, ছাদের গর্ত, ফ্রিজের নিচে, সিমেন্টের পাত্র, বাঁশের গুড়ি, নারকেল খোলা, ডাবের খোলা ও গাছের গুড়ির মধ্যে গর্তে ডিম পাড়ে।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে যেহেতু এই রোগের সংক্রমণ মানুষের থেকে মানুষে ছড়ায় না, সেহেতু যদি আমরা ডেঙ্গু রোগকে রোধ করতে চাই তাহলে যে কোনও ভাবে নিম্নলিখিত দুই উপায় অবলম্বন করা জরুরি।

১) এডিস মশার কামড়ের থেকে নিজেকে বাঁচানো।

২) এডিস মশার জীবনচক্রকে ধ্বংস করা।

এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের কোনও প্রতিষেধক বা সারানোর কোনও ঔষধ নেই। তাই এই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করাই সব থেকে উপযুক্ত।

অতএব ডেঙ্গু মোকাবিলায় নিম্নলিখিত উপায়ে বাহক (মশা) নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

১) নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় :

ক) মস্‌কিউটো রিপেলেন্ট ক্রিম, ধূপ, তেল ইত্যাদির ব্যবহার।

খ) ফুলহাতা জামা ও প্যান্ট পরিধান করা।

গ) মশারি ব্যবহার করা, এমনকি দিনের বেলায় শোবার সময়েও।

ঘ) জানালায় মশার নেট বা জাল ব্যবহার করা।

২) মশার প্রজনন নিয়ন্ত্রণের উপায় :

ক) মশার প্রজননের স্থান নির্ণয় ও ধ্বংস করা।

খ) ছাদ, বারান্দা এবং সানশেড পরিষ্কার রাখা, যাতে সেখানে জল জমে না থাকে।

গ) ব্যবহারযোগ্য জমানো জলকে ঠিকঠাক ঢেকে রাখা।

ঘ) সপ্তাহে অন্তত একদিন জলের পাত্র খালি করে ঘষে পরিষ্কার করার অভ্যাস রাখা।

ঙ) নর্দমা, খানাখন্দ এবং জল জমা নিচু জমি পরিষ্কার ও শুকনো রাখা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য শুধুমাত্র কীটনাশকের উপর নির্ভর না করে কমিউনিটি ভিত্তিক সার্বিক বাহক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া উচিত। গণ মাধ্যম দ্বারা প্রচার ছাড়াও স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র, এন জি ও, কর্মী সংগঠন ও বাসিন্দাদের যৌথ প্রয়াসই মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে ও আশেপাশে জমা জল ও ছোটোখাটো পাত্রকে শুকনো ও পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ। এলাকায় ডেঙ্গু রোগ চলাকালীন জ্বর হলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে চিকিৎসা করা উচিত নয় এবং ডেঙ্গু রোগীকে দিবারাত্র মশারির ভিতর রাখা উচিত।

ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকায় আগমনকারীদের নিজেকে রক্ষার্থে মশারি, হাত-পা ঢাকা জামাকাপড় এবং মশা তাড়ানোর ক্রিম ব্যবহার করা উচিৎ।

এত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, কিছু গুরুতর বাধা-বিপত্তি থেকে যায়, যাকে অতিক্রম করা শক্ত। যেমন—

ক) ভিন্ন ধরনের সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব।

খ) প্রাকৃতিক উষ্ণতাবৃদ্ধি।

গ) মানুষের জীবনচর্যার পরিবর্তন যাতে মশার লার্ভা জন্মানোর অনুকুল পরিবেশ তৈরি হয়।

ঘ) অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত জল সরবরাহ।

ঙ) সমাজব্যবস্থার দ্রুত আধুনিকীকরণ ও নগরায়ন।

এই ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্জ্য ও আবর্জনা দূরীকরণ, নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণ, নিচু জমি ভরাট ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা দরকার। তবেই আমরা ডেঙ্গু রোগের বাহক নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির সফল রূপায়ণ করতে পারব। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : ডা. মাঝি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্তা (জন স্বাস্থ্য) এবং ডা. রায় ওই দপ্তরেরই এপিডেমিওলজিস্ট (জনস্বাস্থ্য)।)

সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা

*পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে মহিলাদের অসামান্য ভূমিকাকে ভিত্তি করে সামাজিক সহায়তা প্রদান নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। মহিলাদের জন্য যুগোপযোগী সামাজিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক অন্তরায় রয়েছে। নারী আন্দোলনের প্রবক্তারা কয়েক দশক ধরে চেষ্টা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিলেই চলবে না, পাশাপাশি অর্থনীতিতে তাদের অবদানকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। জোর দেওয়া হয় এই স্বীকৃতি ছাড়াও মহিলাদের অবদানকে আরও বেশি ফলপ্রসূ ও উৎপাদনমুখী করে তোলা এবং তাদের জন্য আর্থিক পুরস্কার তথা আর্থ-সামাজিক সহায়তাদানের সংস্থান রাখার ওপরও। মহিলাদের এবং সেই সঙ্গে অবহেলিত, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা প্রয়াসের প্রথম সারিতে তুলে আনার ওপরই উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করবে। লিখেছেন—***

দেবকী জৈন

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন সামাজিক নীতি রূপায়ণের ফলে দরিদ্র মহিলারা কতটা উপকৃত হচ্ছেন বা ভবিষ্যতে হতে পারেন সেটা যাচাই করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। গোড়াতেই উল্লেখ করতে হয়, আর্থিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ও দুর্গম পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলাদের সামাজিক চাহিদা পূরণের পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের উৎপাদনশীল কাজকর্ম ও পরিবার-পরিবেশে তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি ও মান্যতা দেওয়ার বিষয়টিকে আলোচ্য নিবন্ধে সর্বতোভাবে সমর্থন করা হয়েছে।

পরিবার ও গোষ্ঠীজীবনে পরিবর্তন সাধনে মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের অবদানকেও ছাপিয়ে যায়। সামাজিক নীতির অন্যতম অবলম্বনস্বরূপ মহিলাদের এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। গতানুগতিক সামাজিক নীতিতে অবশ্য মহিলাদের অন্য চোখে দেখা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে তারা দুর্বল ও সহায়তার মুখাপেক্ষী, তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ইচ্ছা কম এবং সাধারণভাবে তারা পুরুষসমাজ বা বহির্বিশ্বের অধীনস্থ। দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারগুলিতে বাস্তব চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম।

পরিবারের মধ্যে নানান ক্ষেত্রে, যেমন—জল, জ্বালানি, খাদ্য, সেবাশুশ্রূষার মতো মৌলিক চাহিদার সংস্থানে মহিলাদের অবদান অনস্বীকার্য। দুর্ভিক্ষের মতো গভীর সংকটের দিনে অথবা খরাকবলিত এলাকায় যখন খাদ্যের অভাবে হাহাকার—সেই সময় মহিলারাই ত্রাণকর্মীর ভূমিকা নিয়ে বনবাদাড় থেকে ফলমূল, গাছের শিকড়, শাকপাতা জোগাড় করে পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

এই প্রেক্ষিতেই পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে মহিলাদের অসামান্য ভূমিকাকে ভিত্তি করে সামাজিক সহায়তা প্রদান নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনও তাঁর একটি লেখায় মানুষকে কেবল 'ভোক্তা' বা চাহিদাপ্রার্থী হিসাবে গণ্য না করে তাকে পরিবর্তন সাধনের কারিগর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুযোগ পেলে এই মানুষই তার চিন্তা, মূল্যায়ন, সঙ্কল্প, প্রেরণা ও প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম।[১]

মহিলাদের জন্য যুগোপযোগী সামাজিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক অন্তরায় রয়েছে। প্রথম বাধা, বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির অভাব। এর আগে, গত শতকের সত্তর দশকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর তার ভিত্তিতে নীতি প্রণীত হতো। তখনকার নীতির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলিতে মহিলাদের একাংশ স্বল্পতর সক্ষম, যেমন—দুস্থ, বিধবা ইত্যাদি শ্রেণিভুক্ত হতেন। ধরে নেওয়া হতো এই মহিলাদের জন্য অবশ্যই সমাজ কল্যাণমূলক পরিষেবা জোগানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারী আন্দোলনের প্রবক্তারা কয়েক দশক ধরে চেষ্টা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিলেই চলবে না, পাশাপাশি অর্থনীতিতে তাদের অবদানকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। জোর দেওয়া হয় এই স্বীকৃতি ছাড়াও মহিলাদের অবদানকে আরও বেশি ফলপ্রসূ ও উৎপাদনমুখী করে তোলা এবং তাদের জন্য আর্থিক পুরস্কার তথা আর্থ-সামাজিক সহায়তাদানের সংস্থান রাখার ওপরও।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই দাবি আরও প্রমাণসিদ্ধ ও জোরদার হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে যে, শিশুসন্তান পালন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা এবং ঘরগেরস্তালির কাজে মহিলাদের ভূমিকাকে শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়াই নয় এর আর্থিক মূল্যায়নও হওয়া দরকার এবং এইসব কাজে ব্যয়িত সময়ের নিরিখে তাদের অর্থমূল্যও দেওয়া উচিত। দিনের অধিকাংশ সময় এসব কাজে নিযুক্ত

তথ্য সহায়তা : নেহা চৌধুরী ও স্মিত গার্ধিয়া

থাকার দরুন মহিলারা ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের মতো অর্থে উপার্জনের সুযোগ পান না, তাই ওই দাবির যৌক্তিকতা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

মহিলাদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, মহিলারা যেসব কাজে জড়িত থাকেন তার সামগ্রিক মূল্য নির্ধারিত ও সংযোজিত করা হলে তাদের শ্রমের সংজ্ঞাও আরও ব্যাপকতর হবে।

এজন্য ব্যক্তিগত ও পরিবারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজকে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক মানের করতে হবে। সমীক্ষা চালানোর প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর স্থান পেয়ে থাকেন পুরুষরা, মেয়েদের স্থান পরিপূরক আয়ের সূত্র অথবা অন্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসাবে। যদিও ইতোমধ্যেই ভারত-সহ বিশ্বের নানান দেশে মহিলাদের কাজে নিযুক্ত থাকার সময় এবং অর্থনৈতিক অবদানের ভিত্তিতেও সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে মজুরির হিসাব বাদেই মহিলাদের, বিশেষ করে যারা ভূমিহীন বা দরিদ্র পরিবারভুক্ত, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান পুরুষদের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। স্পষ্টত একমাত্র সঠিকমানের তথ্য বা ডেটা সংগ্রহই সুনিশ্চিত করতে পারে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন-এর বিষয়টি।

এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, প্রচলিত পন্থায় ডেটা সংগ্রহকালে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নমালায় কাজের পরিধি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে পরিবারের মেয়েরা প্রায়ই ঘরগেরস্তালিতে আবদ্ধ থেকে যান; এমনকী তারা যদি আংশিক সময়ের জন্যও উৎপাদনের কাজে জড়িত থাকেন—সেই তথ্যও অন্তর্ভুক্ত হয় না। আমাদের দেশে এমনটা আকছার ঘটে থাকে।

রেনানা ঝাবালার সমীক্ষায় এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন, "মহিলা-শ্রমিকরা প্রায়শই অলক্ষ্যে থাকেন বা স্বীকৃতি পান না। মহিলা বলেই এমনটা ঘটে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ প্রায়শই চোখেই পড়ে না। অর্থনীতিতে বা পরিবার ও গোষ্ঠীজীবনে মহিলাদের অবদান ধারাবাহিকভাবে যথোচিত স্বীকৃতি পায় না। অবমূল্যায়নের এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যখন মহিলারা অর্থের বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঠিকে বা আয়ার কাজ করেন অথবা বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক ব্যবসা বা পরিবারিক খেতখামারে কাজ করেন। বাড়ির কাজ বা শিশু পরিচর্যার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে শ্রমিক হিসাবে অর্থনীতিতে তাদের অবদানের ওপর। এভাবেই একদিকে পরিবার, অন্যদিকে অর্থনীতিতে অবদান রেখে তারা শ্রমশক্তির অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে উঠবেন এবং আর্থ-সামাজিক নীতির মধ্যমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।" [২]

"মহিলা-শ্রমিকরা প্রায়শই অলক্ষ্যে থাকেন বা স্বীকৃতি পান না। মহিলা বলেই এমনটা ঘটে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ প্রায়শই চোখেই পড়ে না। অর্থনীতিতে বা পরিবার ও গোষ্ঠীজীবনে মহিলাদের অবদান ধারাবাহিকভাবে যথোচিত স্বীকৃতি পায় না। অবমূল্যায়নের এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যখন মহিলারা অর্থের বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঠিকে বা আয়ার কাজ করেন অথবা বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক ব্যবসা বা পরিবারিক খেতখামারে কাজ করেন।"

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা'র (২০০৭-২০১২)[৩] প্রস্তুতিপর্বে যোজনা আয়োগের পক্ষ থেকে নারীবাদী অর্থনীতিবিদদের নিয়ে এক কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করা হয়।[৪] গতানুগতিকভাবে 'মহিলা ও উন্নয়ন' পরিচ্ছেদের খসড়া রচনার সঙ্গে জড়িত থাকা ছাড়াও গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্যান্য পরিচ্ছেদে (যেমন—পরিকাঠামো, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি) উল্লেখিত বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের সময় ওই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যেসব সুপারিশ করা হয় তার একটি ছিল 'পরিকাঠামো উন্নয়ন' বিষয়ক। উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব ক্ষেত্রে বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে এটি তারই একটি। সেই সময় গোষ্ঠীর সদস্যরা জোরদার সওয়াল করেছিলেন 'সামাজিক পরিকাঠামো'-র মতো একটি ক্ষেত্রের সপক্ষে।

'সামাজিক পরিকাঠামো' বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ হল সেইসব সহায়তা পরিষেবা, যার সাহায্য নিয়ে দীনদরিদ্র মহিলারা সমষ্টি জীবনে বা অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে এমন একটি আবাসিক কমপ্লেক্সের কথা ভাবা হয়েছিল যাতে থাকবে ক্রেশ বা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, জলের কল, স্নানাগার এমন কী একটি শৌচাগার ও কাপড় কাচার স্থানের মতো সহায়ক-ব্যবস্থা। এ ধরনের বিল্ডিং, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য বিনিয়োগকে পরিকাঠামোর আওতাধীন করা যেতে পারে; যেমনটা করা হয়ে থাকে শহরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তদের জন্য বড়ো বড়ো অফিস বা আবাসন কমপ্লেক্স তৈরির ক্ষেত্রে।

এ রকমটা হলে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণিভুক্ত দারিদ্র্যজর্জরিত মহিলারা সহজেই একটি সামুদায়িক ভবন পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন; সেক্ষেত্রে তাকে নিজের বাড়িঘর সামলানোর দায়িত্ব বাড়ির বড়ো মেয়েদের হাতে দিয়ে জ্বালানি ও পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতে হবে না। এই সুযোগ পেলে মহিলা তার শিশু সন্তানকে রাখবেন ক্রেশে, যৌথ রান্নাঘরের চুলোয় রুটি সেঁকতে পারবেন এবং স্নানঘর সংলগ্ন স্থানে কাপড় কাচার পর কাজের জায়গায় যেতে পারবেন।

বিশ শতকের সত্তর দশকে নীতি প্রণেতাদের যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্যের সম্মুখীন হতে হয় তার একটিতে নারী মৃত্যুহার এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার—এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি একমুখী প্রবণতা চোখে পড়েছে। বয়োনির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ

সারণি অনুসারে ২০-৩৫ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মনিযুক্তির হার লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে আবার এই বয়োক্রমের মহিলাদের মধ্যেই সর্বোচ্চ মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয়। তথাকথিত বিমারু রাজ্যগুলিতে[৫] (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ), যেখানে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি, সেখানে এই প্রবণতা খুবই স্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এটাই অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে যে গৃহস্থালীর নানারকম কাজ করার পরও পারিবারিক বাধ্যবাধ্যতা বা চাপের কারণে উপার্জনের তাগিদে মহিলারা বাইরেও পরিশ্রম করতে যান। এসবের সম্মিলিত কারণে দ্রুত তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। উদাহরণটি এই যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত করে যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজনীতি পরিষেবাকে অবশ্যই মহিলাদের, বিশেষ করে দরিদ্রতর মহিলাদের সার্বিক অর্থনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট করা আবশ্যক। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযানে এই সমাধানসূত্রের বিকল্প নেই।

মহিলাদের এবং সেই সঙ্গে অবহেলিত, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা প্রয়াসের প্রথম সারিতে তুলে আনার ওপরই উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করবে। একটি অবশ্য পালনীয় পন্থা হল পরিকল্পনা প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে যেসব সমীক্ষা পরিচালিত হবে সেগুলিতে গোষ্ঠী-আলোচনার ভিত্তিতে মহিলাদের সামিল করা এবং তাদের মতামত নেওয়া। চিহ্নিত করতে হবে নারী সমাজের নেতৃত্বকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রস্তাবিত কমিটিতে ওই নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একমাত্র এ ভাবেই সামাজিক উন্নয়ন ছাড়াও পরিকাঠামো, সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলাদের যুক্ত করা সম্ভব হবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক পদ্মভূষণ জয়ী, গান্ধীবাদী, নারীবাদী, অর্থনীতিবিদ। 'ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভস্ ফর উইমেন ফর এ নিউ এরা' ও 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। বর্তমানে বোর্ড অফ জি আর আই, চেন্নাই কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, বেঙ্গালুরুর সদস্য। ইমেল : devakijain@gmail.com)

গ্রন্থপঞ্জী :

[1] (Sen, Amartya, 'Transition to Sustainability in the 21st Century', Keynote Address, at the Inter-Academy Panel called Sustainability and Freedom on International Issues, 15th May, 2000.

[2] Jhabvala, Renana, "Poor Women Organizing themselves for Economic Justice", - a paper which is based on her own experiences organizing informal women workers and is an attempt to interpret those experiences in the context of agency towards economic justice. For this reason, most of the paper refers to Indian experiences although there is some evidence from international organizing.

[3] Engendering Public Policy : A Report on the work of the Working Group of Feminist Economists during the preparation of thc Eleventh Five Year Plan (2007-2012), May 2010, Planning Commission Government ofIndia. Please see : (http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_engpub.pdf)

India : Planning Commission, Government of India. Eleventh Five Year Plan 2007-2012.2 Vols. New Delhi : OUP, 2008. Also at http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm

Jain D. and Hameed, S. (Assisted by Priyanka Mukherjee and Divya Alexander) (2009) Feminist Economists Engage with India's Eleventh Five Year Plan, Paper for IAFFE Conference on Engendering Economic policy, Boston.

[4] http://www.feministeconomics.org/

[5] BIMARU is an an acronym Iorncd from the first letters of the names of the states. It was coined by Ashish Bose in the mid-1980s. BIMARU has a resemblance to a Hindi word "Bimar" which means sick.

উল্লেখপঞ্জী :

Antonopoulos, R. (2009) The Unpaid Care work-paid work connection (working paper 86), Policy Integration and Statistics Department, Intemational Labour Office, Geneva.

Bhattacharya, A. (2015) Care work, Capitalist Structure and Violence Against Women-paper presented at National Convention on Advocacy for Care Work, New Delhi.

Ghosh, J. (2015) *Women's Burden* in Jain, D. and Sujaya, C.P. (Eds.) Indian Women, Publication Division. Government of India.

Ghosh J. Women's work in India in the 21st Century. Please see : http://www.sundarayya.org/sites/default/files/papers/jayati.pdf

Ghosh, J. (2015) Care in the neo-liberal economic model : International policies and their impact on Women's and girls' unpaid care-paper presented at the National Convention on the Advocacy for Care Work, New Delhi.

Jain, Devaki (2001), "Through the looking glass of poverty", paper presented in New Hall, Cambridge.

Jain, Dcvaki (1985), "The Household trap : Report on a Field Survey of Female Activity Patterns" in *Tranny of the Household : Investigative Essays on Women's Work*, Edited by Jain, D. and Banerjee, N., Shakti Books, Vikas Publication Hose, India.

Jain. D and Tsushima. R. (2008) Presentation on "Contextualizing Women's Work within the Current Macro Economic Incentives in India".

Jain. D. (1990) Development Theory and Practice : Insights Emerging from Women's Experience, *Economic and Political Weekly*, 25(27).

Jain, Devaki (1979) *Valuing Work : Time as a Measure.* Economic and Political Weekly, Vol. XXXI, No. 43. October 26 1996, and Institute of Social Studies Trust, "Impact on Women Workers - Maharashtra Employment Guarantee Scheme," a study sponsored by ILO, Geneva. (Mimeo).

Jain. D (2006) Women's Economic Reasoning and Development Economics: A discussion on some intersections.

স্তন্যপানের প্রসারের জন্য "মা" প্রকল্প

সম্প্রতি "মা" (Mothers Absolute Affection, সংক্ষেপে MAA, আক্ষরিক অর্থে মায়ের সম্পূর্ণ স্নেহ) প্রকল্পটির সূচনা হয়। এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে, বিশেষত মায়েদের মধ্যে স্তন্যপানের উপকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেনতা সৃষ্টি করা।

স্তন্যপানের জন্য সহায়তা প্রদান করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাউন্সেলিং পরিষেবার সংস্থান-সহ স্তন্যপানের প্রসারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা স্বরূপ সারা দেশ জুড়ে "মা" প্রকল্প চালু করা হল। স্তন্যদায়ী মা যাতে সফলভাবে স্তন্যপান করাতে পারেন, সে জন্য পরিবার ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোর সহায়ক ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কারণেই প্রকল্পের নামকরণ "মা" করা হয়। জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, "আশা"-র মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আরও জোরালো করা, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্তন্যপান করানোর জন্য দক্ষ সহায়তা প্রদান করা এবং নজরদারি ও পুরস্কার/স্বীকৃতি "মা" প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ।❑

২০১৩-'১৬-র মধ্যে উজ্জ্বলা প্রকল্পে ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ১৮১২৫ উপকৃত

বাণিজ্যিক যৌন শোষণের জন্য পাচার প্রতিরোধ এবং এ ধরনের পাচারের শিকারদের উদ্ধার, পুনর্বাসন, পুনঃসমন্বয় ও প্রত্যর্পণের মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের উজ্জ্বলা (Ujjawala) প্রকল্পের অঙ্গ। ২০১৩ থেকে ২০১৬, এই সময়-কালে এই প্রকল্পের জন্য মন্ত্রক রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে মোট ৪২ কোটি টাকা দেয়। উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ১৮,২১৫। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে (২০১৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত) ১৪৩.০৭ লক্ষ টাকা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয়। উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় নারী ও শিশু পাচার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন, নজরদারির জন্য স্থানীয় মানুষের দল (কমিউনিটি ভিজিলেন্স গ্রুপ) গঠন ও পরিচালন, সামাজিক চেতনা ও স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, কর্মশালা/আলোচনাসভার মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা চালানো, গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্যামফ্লেট, লিফলেট ও পোস্টার তৈরি ও ছাপানো।❑

২০১৩-'১৬-র মধ্যে IGMSY-এ ৮০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ ও প্রায় ১৪.৩ লক্ষ উপকৃত

নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক 'ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা' (IGMSY) বাস্তবায়িত করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য আর্থিক অনুদান দেয়। এটি একটি শর্তসাপেক্ষ মাতৃত্বকালীন সুবিধা (Conditional Maternity Benefit বা CMB) প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় দু'টি সমান কিস্তিতে সুবিধাভোগীপিছু মোট ছ' হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু শর্তসাপেক্ষে ১৯ বছর বা তার বেশি বয়সী গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েরা প্রথম দু'টি জীবিত শিশু প্রসবের জন্য এই সুবিধা পেতে পারেন। IGMSY-এর উদ্দেশ্য ব্যাংক/ ডাকঘর অ্যাকাউন্টে নগদ সহায়তার মাধ্যমে গর্ভবস্থার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে শিশুর ছ' মাস বয়স পর্যন্ত গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২০১৩ থেকে ২০১৬, এই সময়কালে এই প্রকল্পের জন্য মন্ত্রক রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে মোট ৮০৮ কোটি টাকা দেয়। উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ১৪,৩২,৪১১। দেশ জুড়ে ৫৩-টি বাছাই করা জেলায় IGMSY চালু রয়েছে।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ সালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৩ সালের ৫ জুলাই থেকে মন্ত্রক মাতৃত্বকালীন সুবিধার প্রাপ্য অঙ্কটি চার হাজার থেকে বাড়িয়ে ছ' হাজার টাকা করেছে। ২০১৬-'১৭ সালের চলতি অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা।❑

মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও সুষ্ঠ পরিবেশের জন্য সরকারি প্রকল্প

সরকার সমান পারিশ্রমিক আইন, ১৯৭৬ বাস্তবায়িত করেছে। এই আইনে নারী ও পুরুষ কর্মীদের একই কাজ বা একই ধরনের কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার সংস্থান আছে। এই আইন অনুযায়ী নিয়োগ বা নিযুক্তির কোনও শর্তে নারীদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা লাগু করছে। সংশ্লিষ্ট সরকার নিযুক্ত 'ইন্সপেক্টার' বা পরিদর্শকরা আইন অমান্য হতে দেখলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। এই আইন সারা ভারতে প্রযোজ্য।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষিত রাখতে 'কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষেধ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩' রূপায়িত হয়। নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক কর্মরত মহিলা, যারা কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে দূরে থাকেন, তাদের জন্য সুরক্ষিত বাসস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য হোস্টেল-এর প্রকল্প চালু করেছে এবং কর্মরত মায়েদের সন্তানদের দিনের বেলা দেখভালের সুবিধার জন্য রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ প্রকল্পও চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, নিয়োগ-নীতি মহিলা কর্মচারীদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করতে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১ সালের আওতায় মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুর পরিচর্যার জন্য ছুটির (Child Care Leave) সংস্থান করা হয়। পাশাপাশি, পিতৃত্বকালীন ছুটিরও (Paternity Leave) সংস্থান করা হয়।❑

স্বাধীনতার যোদ্ধা সেইসব অগ্নিকন্যা

● **অরুণা আসফ আলি :**

১৯০৯ সালে এক বাঙালি পরিবারে জন্ম। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতেখড়ি। গান্ধী-আরউইন চুক্তির কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ প্রশাসন তাকে গ্রেপ্তার করেন। ফের ১৯৪১ সালে একক সত্যাগ্রহের জন্য গ্রেপ্তার হন। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট সব বড় মাপের নেতা গ্রেপ্তার হন; তাই ৯ আগস্ট গোয়ালিয়া ট্যাংক ময়দানে প্রথমবার তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করতে এগিয়ে আসেন তিনি। ১৯৪২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তার সমস্ত সম্পত্তি ও জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তা ফেরৎ পাওয়ার জন্য তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। রাজি না হওয়ায় তার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয়। ড. রাম মনোহর লোহিয়ার সঙ্গে একত্রে তিনি 'ইনকিলাব পত্র' নামে একক্সিট প্রকাশনা শুরু করেন। এর মাধ্যমে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়, অনেক সরকারি কর্মচারি চাকরি ও হাজার হাজার পড়ুয়া কলেজ ছেড়ে দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করতে ও নেতৃত্ব দিতে। তাকে '১৯৪২-এর ঝাঁসির রানি' বলা হয়। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লি পৌর নিগমের প্রথম মহিলা মেয়র হন। 'লিঙ্ক' ও 'প্যাট্রিয়ট' নামক দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হন তিনি।

● **সুচেতা কৃপালনী :**

১৯০৮ সালে আম্বালায় এক বাঙালি পরিবারে জন্ম। লাহোরে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার পাঠ শেষ করার পর, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতে বসবাস করার। ১৯৩৯ সালে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। জনসেবার মধ্যে দিয়ে দেশসেবায় তার অবদানে প্রভাবিত হয়ে ১৯৪০ সালে গান্ধীজি তাকে সত্যাগ্রহের জন্য বেছে নেন। এর জন্য তাকে গ্রেপ্তারও হতে হয়। ১৯৪২-'৪৩ সালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং সেই অবস্থাতেই নিজের কাজকর্ম চালিয়ে যান; সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঞ্চের মাধ্যমে মহিলাদের উদ্দেশ্যে দেশের জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য বার্তা দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি ১৯৪২ সালে একটি 'গোপন স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গঠন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের অস্ত্র চালনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, আত্মরক্ষা ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া। দু' বছর পর, ১৯৪৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বেশিরভাগ সময় সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গে ও ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অপহৃত মহিলাদের তিনি আশ্রয় দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। ১৯৬৩ সালের মার্চ থেকে ১৯৬৭ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

● **কল্পনা দত্ত :**

উচ্চশিক্ষিত এই বাঙালি বিপ্লবী কন্যা ইংরেজি শাসন ও ভাষাকে ঘৃণা করতেন। স্কুলে 'ঈশ্বর ও রাজা'-র প্রতি আনুগত্যের শপথবাক্যকে তিনি 'ঈশ্বর ও দেশ'-এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারে পরিণত করতে চান। স্কুল-কলেজের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে পড়ার সময়ই লাঠি-তলোয়ারের মতো অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। ১৯২৯ সালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসলেও, ১৯৩২ সালের পরই তিনি পুরোপুরিভাবে তাদের দলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাধারণত পুরুষদের পোশাকে থাকতেন। গোপনে সরকারি ভবনে হানা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশ তার উপর নজর রাখে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। পাহাড়তলিতে ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিপ্লবী অভিযানের সময় পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায় যে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য। ১০৯ নম্বর ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়, কিন্তু প্রমাণের অভাবে জামিন পেয়ে যান। তারপর তিনি পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেন। অবশ্য, তিন

মাস পরে ধরা পড়ে যান এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় তাকেও অভিযুক্ত করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার। ১৯৪২ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশীকে বিয়ে করেন।

● **রানি গাইদিনল্যু :**

তিনি "নাগা লক্ষ্মীবাই" নামে পরিচিত। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। তার দূর সম্পর্কের দাদাকে ব্রিটিশ শাসকরা ফাঁসি দেয়। এর পরই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন তিনি। তার বয়স তখন মাত্র ১৬। সে সময় শুধুমাত্র চারজন সশস্ত্র নাগা সৈনিক নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামেন। গেরিলা যুদ্ধ ও অস্ত্র চালনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক নাগা নেতা। ১৯৩২ সালে ধরা পড়ে যান। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যখন মুক্ত হলেন, তখন তার বয়স ৩০ বছর। বীরত্বের জন্য পণ্ডিত নেহরু তাকে 'রানি'-র তকমা দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকার জন্য পদ্মভূষণে সম্মানিত করা হয় তাকে।

● **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার :**

১৯১১ সালে চট্টগ্রামে জন্ম। মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পর, ডিস্টিংশান নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। তারপর লীলা নাগের দীপালী সংঘ ও কল্যাণ দাসের ছাত্র ইউনিয়ান-এ প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করে যে বিপ্লবীরা, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। পুলিশের সাথে সংঘর্ষের পর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে পালিয়ে যান। পুলিশের গুলিতে নিহত সাথীদের মৃত্যুর বদলা নিতে দলের নেতা সূর্য সেন একটি নাইট ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। এই ক্লাব ব্রিটিশ-সহ ইউরোপীয়দের জনপ্রিয় আড্ডা ছিল। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও অন্যান্য সদস্যরা মিলে পিস্তল ও বোমা দিয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন। ব্রিটিশরা পালটা প্রতিরোধ করলে তিনি গুলিতে আহত হন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ-এর গুলিতে মরার চেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ শ্রেয়। তাই, মৃত্যু আসন্ন বুঝে তিনি পূর্ব-পরিকল্পনা মতো সঙ্গে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।

● **মাতঙ্গিনী হাজরা :**

১৮৬৯ সালে তমলুকের কাছে হোগলা গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যকালে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। অতি অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয় এবং মাত্র আঠারো বছর বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নারীদের আন্দোলনে যোগদান। ১৯০৫ সালে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মাতঙ্গিনী হাজরা। মতাদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময়ে লবণ আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। অল্প সময় পরেই অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কর মকুবের দাবিতে প্রতিবাদ করার জন্য আবার তাকে বহরমপুরের কারাগারে ছ' মাস বন্দী করে রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করেন এবং নিজের হাতে চরকা কেটে খাদি কাপড় বানাতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে মাতঙ্গিনী শ্রীরামপুরে মহকুমা কংগ্রেস অভিবেশনে যোগ দিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের সময় আহত হন।

১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক-সহ ছয় হাজার সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন ৭৩ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। শহরের উপকণ্ঠে মিছিল পৌঁছলে ব্রিটিশ পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই আদেশ অমান্য করে মাতঙ্গিনী এগিয়ে গেলে তাকে গুলি করা হয়। তা সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী এগিয়ে চলেন এবং পুলিশের কাছে আবেদন করেন জনতার উপর গুলি না চালাতে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আরও এগোনোর চেষ্টা করলে বারংবার তার উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। জাতীয় পতাকাটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে উঁচিয়ে ধরে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্তটিকে সামনে রেখে মানুষকে বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পরে গান্ধীজির অনুরোধে এই সমান্তরাল সরকার ভেঙে দেওয়া হয়।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যোজনা ? কুইজ

বিষয় : জাতীয় আন্দোলন

১. ‘ভারতমাতা’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

২. কোন অধিবেশনে কংগ্রেসে চরমপন্থী নরমপন্থী বিভাজন ঘটে?

৩. মহাত্মা গান্ধী একবার মাত্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কবে?

৪. উত্তর ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রধান প্রবক্তা কে ছিলেন?

৫. ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন?

৬. সিপাহি বিদ্রোহকে কে স্বাধীনতার জন্য প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন?

৭. ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা কোন আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল?

৮. কার পরিচালনায় বারাণসীর ‘সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল’ ‘বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়’-এ পরিণত হয়?

৯. ‘Passive Resistance’-এর কথা কে বলেন?

১০. ভারতে গান্ধীজী কোথায় প্রথম আন্দোলন করেন?

১১. ভারত বিভাজনের উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেন প্রথম কোন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন?

১২. কোন ঘোষণার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে?

১৩. জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল কোনটি?

১৪. জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে মাদাম কামা পরিকল্পিত ভারতের যে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, তার মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে কী লেখা ছিল?

১৫. ‘সরফারোশি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হ্যায় ...’ গানটি কার রচনা?

উত্তর :

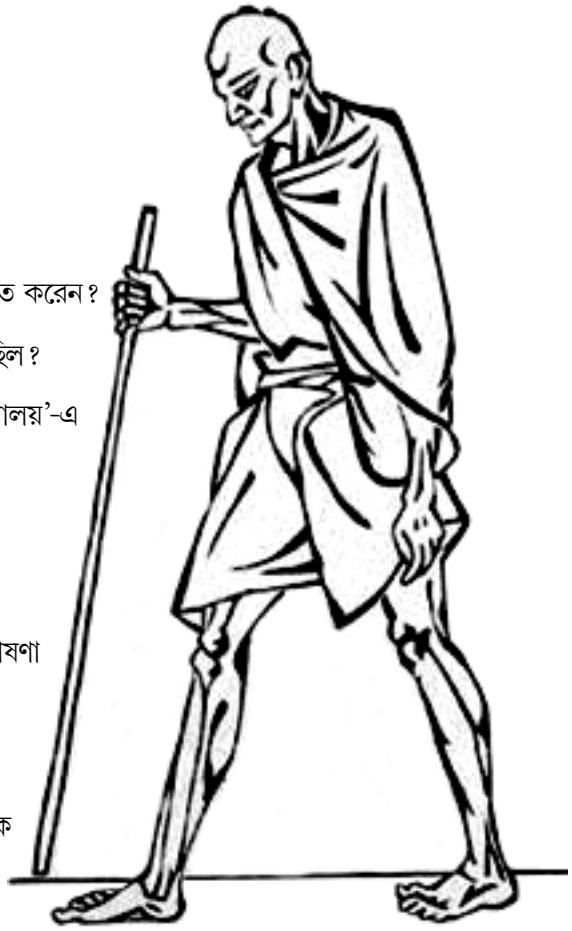

১. অজিত সিং। ২. ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশন। ৩. ১৯২৪ সালের বেলগাঁও অধিবেশন। ৪. স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ৫. ভগৎ সিং ও তার সহযোগীরা। ৬. ভি ডি সাভারকর। ৭. তেভাগা আন্দোলন। ৮. মদনমোহন মালব্য। ৯. অরবিন্দ ঘোষ। ১০. চম্পারণ, বিহার। ১১. প্ল্যান বলকান। ১২. মহারানির ঘোষণা (Queen’s Proclamation), ১৮৫৮ সালে। ১৩. ভারত সভা। ১৪. বন্দে মাতরম। ১৫. রামপ্রসাদ বিসমিল।

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ জুলাই—২১ আগস্ট, ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **ইসলামাবাদে সার্ক-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন :**

গত ৪ আগস্ট সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে। ভারতের পক্ষ থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদ যান রাজনাথ সিংহ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, সংক্ষেপে সার্ক। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটান সার্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কের সদস্য পদ লাভ করে। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ান, ইরান, মরিশাস, মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও জাপান সার্কের নির্বাচিত 'পর্যবেক্ষক'। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সচিবালয় ১৯৮৭ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়।

● **গণভোটের পথে ভেনেজুয়েলা :**

ভেনেজুয়েলার উগো চাভেসের বেছে নেওয়া উত্তরসূরি, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে গণভোটের পথে প্রথম ধাপটি পেরোল দেশের বিরোধী দলগুলি। সেদেশের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, গণভোটের আয়োজন করতে হলে দেশের ভোটারদের অন্তত ১ শতাংশের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। আগস্ট মাসের গোড়ায় 'ন্যাশনাল ইলেকটরাল কাউন্সিল' জানায়, বিরোধীরা ৪ লক্ষ ৮ হাজার সই সংগ্রহ করে জমা দিয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি প্রায় পুরোটাই পেট্রোলিয়াম-নির্ভর। দেশের জাতীয় আয়ের অর্ধেকটা আসে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি থেকে, আর দেশের মোট রপ্তানির ৯৫ শতাংশই পেট্রোলিয়াম। তেলের দাম কমতেই পেট্রোলিয়াম-রপ্তানিকারক দেশ ভেনেজুয়েলা বড়ো সমস্যায় পড়ল। কয়েক বছর আগেও সেদেশের অর্থনীতি লাতিন আমেরিকায় শীর্ষে ছিল। ভিনদেশি শ্রমিকরা সেদেশে পাড়ি জমাতেন উন্নততর জীবনযাত্রার খোঁজে। সেই ভেনেজুয়েলা এখন নেই-রাজ্য। সরকারি হিসেবেই মূল্যস্ফীতির হার ৭০০ শতাংশ। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন।

● **নেপালের প্রধানমন্ত্রী ফের পুষ্পকমল দাহাল :**

জুলাই মাসের শেষ নাগাদ নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সিপিএন-ইউএমএল নেতা খড়্গপ্রসাদ ওলি। এর দিন দশেক পরেই ফের সিপিএন-মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দাহাল ওরফে প্রচণ্ড তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৫৯৫ আসনের পার্লামেন্টে ৩৬৩ জনের সমর্থন পান প্রচণ্ড।

প্রচণ্ড-র নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন নেপালের মাওবাদীরা। রাজতন্ত্র থেকে মুক্তির পরে ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী হন প্রচণ্ড। কিন্তু সে বার ন' মাসের মাথায় ইস্তফা দেন সেনাপ্রধানের অপসারণ নিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রামবরণ যাদবের সঙ্গে বিরোধের জেরে। এই নিয়ে আট বছরে আট বার প্রধানমন্ত্রী বদল ঘটল নেপালে।

জাতীয়

● **৫৪ বছর পর ফের সচল পাসিঘাট বিমানঘাঁটি :**

গত ২০ আগস্ট পাসিঘাট এএলজি-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও এয়ার মার্শাল সি হরিকুমার। ৫৪ বছর পরে ফের সচল হল পাসিঘাট বিমানঘাঁটি (১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল পশ্চিম সিয়াং জেলায় অবস্থিত এই বিমানঘাঁটি)। আর এই প্রথম অরুণাচলের আকাশে উড়ে রাজ্যের রানওয়েতে অবতরণ করল যুদ্ধবিমান সুখোই ৩০-এমকেআই। ভারত-চিন সীমান্তে অরুণাচলের ওয়ালং, জিরো, আলো, মেচুকার পরে পাসিঘাটেও অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের (এএলজি) রানওয়ে চালু হল। উল্লেখ্য, এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাশিয়া থেকে প্রথম সুখোই ভারতে উড়িয়ে আনা অরুণাচলি পাইলট মহন্ত পাংগিং।

অরুণাচলের ১৬৮০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে ১০৮০ কিলোমিটার সীমান্তই চিনের সঙ্গে। বিমানবাহিনী ২০০৯ সালে অরুণাচলপ্রদেশের সঙ্গে রাজ্যের আটটি বিমানঘাঁটিকে অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে উন্নীত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে হাজার কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত পাসিঘাট-সহ পাঁচটি এএলজি চালু হল।

● **অসম ও মণিপুরে নতুন রাজ্যপাল :**

নাগপুরের তিন বারের সাংসদ বনোয়ারি লাল পুরোহিতকে অসমের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করা হল। এক বছর আট মাস পরে স্থায়ী রাজ্যপাল নিয়োগ হল অসমে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর থেকে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল পদ্মনাভ বালকৃষ্ণ আচার্য অসমের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল ছিলেন। একই সঙ্গে মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে নাজমা হেপতুল্লার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাজমা হেপতুল্লা ১৯৮৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বার রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। ষোল বছর তিনি ছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে মেঘালয়ের রাজ্যপাল ভি. সন্মুগনাথম মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

● **বিপিএল পরিবারের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ধার্য :**

দেশের ৭০তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন, এবার থেকে বিপিএল পরিবারগুলির ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার জোগাবে। লাল কেল্লা থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, গরিব পরিবারে কোনও সদস্য অসুস্থ হলে যাতে সংসারের আর্থিক অবস্থা ভেঙে না পড়ে, সেই কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নতুন প্রকল্প আনছে।

গরিব মানুষের জন্য চিকিৎসা অনুদান ঘোষণার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন ২০ শতাংশ বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে যারা এখন ২৫ হাজার টাকা পেনশন পান, তারা ৩০ হাজার টাকা পাবেন। বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের ভূমিকা তুলে ধরতে জাদুঘর তৈরি হবে বলেও তিনি জানান।

● **অসমে জিএসটি সংশোধনী বিল পাস :**

পণ্য ও পরিষেবা কর বা 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' (জিএসটি) চালুর রাস্তা সুগম করতে রাজ্যগুলিকে এ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল বিধানসভায় পাস করিয়ে নিতে হবে। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে 'রাজ্য জিএসটি সংবিধান সংশোধনী বিল' পাস করল অসম। গত ১৩ আগস্ট বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সংখ্যাধিক্যের ধ্বনিভোটে বিল পাস হয়। সংশোধনীটি বিধানসভায় পাস হওয়ার কথা ঘোষণা করেন স্পিকার রঞ্জিৎ দাস। উল্লেখ্য, জিএসটি-তে উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ ছাড়ের সুযোগও রাখা হয়েছে। তারা নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে কর হার কমানোর আবেদন জানাতে পারে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিশেষ কর আদায়ও করতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট লোকসভায় জিএসটি সংক্রান্ত ১২২তম সংশোধনী বিলটি পাস হয়। লক্ষ্য, ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে জিএসটি চালু করা। তা করতে হলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে ২৯-টি রাজ্যের মধ্যে অন্তত ১৬-টি রাজ্যে ওই সংশোধনী পাস করাতে হবে। অন্তত ১৬-টি রাজ্য জিএসটি সংক্রান্ত সংশোধনীতে সম্মতি দিলে তা জিএসটি কাউন্সিলে পাঠানো হবে। তারা এর পর নতুন কর কাঠামো নির্ধারণ করবে।

● **বেসরকারি সংস্থাতেও ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি :**

গত ১২ আগস্ট সংসদে সংশোধিত মাতৃত্বকালীন সুবিধা বিল ২০১৬ (মেটারনিটি বেনিফিট বিল) পেশ করেন শ্রমমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয়। রাজ্যসভায় ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যায় সেই সংশোধনী বিল। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের মতো বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত মহিলারাও এবার থেকে ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। বেসরকারি সংস্থাগুলিতে এতদিন ১২ সপ্তাহ বা তারও কম মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতেন মহিলা কর্মীরা।

● **মোটর ভেহিকলস আইনে সংশোধন :**

মোটর ভেহিকলস আইনে সংশোধন করে লোকসভায় গত ১০ আগস্ট বিল পেশ করেন নিতিন গডকড়ী। এই বিলে পুরনো আইনের ২২৩-টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৬৮-টিই সংশোধন করা হয়েছে। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিমা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়ারও সরলীকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর এদেশে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্ঘটনা ঘটে পাঁচ লক্ষ। কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রক 'সড়ক পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিল' তৈরি করার জন্য ঐকমত্য গড়তে রাজস্থানের পরিবহণ মন্ত্রী ইউনুস খানের নেতৃত্বে রাজ্যগুলির একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটিই সুপারিশ করে, নতুন বিলের বদলে বর্তমান মোটর ভেহিকলস্ আইনই সংশোধন করে কড়া শাস্তির বন্দোবস্ত করা হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর এদিন মোটর ভেহিকলস্ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পেশ হয়।

● **ডাকঘর-ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট :**

কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে, আগামী বছরের মার্চের মধ্যে সব রাজ্য সরাসরি ভরতুকি পৌঁছনোর ব্যবস্থার আওতায় চলে আসুক। কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৪-টি প্রকল্পে এখন নগদ ভরতুকি, স্কলারশিপ বা ভাতা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর পরে মোট ১৪৭-টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ডাকঘর। এমনিতেই ডাকঘরের মাধ্যমে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরি দেওয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ডাক বিভাগ বা ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করবে। রিজার্ভ ব্যাংক তার জন্য নীতিগত মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে গ্রামের যে কেউ সরকারি প্রকল্পের আওতায় এলে তিনি ওই ডাকঘর-ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানেই সরকারি অর্থ সাহায্য পেতে পারেন। সরকারের আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী, ব্যাংকে সরকারি অর্থ সাহায্য পৌঁছে দেওয়ায় গত দু' বছরে প্রায় ৩৬,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। কারণ সরকারি সাহায্যের তালিকায় থাকা ভুয়ো নাম, রেশন কার্ড ধরা পড়েছে। এবং, প্রতি মাসে সরকারি অর্থ সাহায্যের টাকা পেতে গিয়ে কাউকে ঘুষ দিতে হচ্ছে না মানুষকে।

● **রেলের 'গ্রিন করিডোর', যাত্রীদের জন্য জীবন বিমা :**

ট্রেনের বর্জ্য আর বাইরে আসবে না। দক্ষিণের রামেশ্বরম রুটে সব ট্রেনের সমস্ত কামরায় বায়ো টয়লেট বা জৈব শৌচাগার বসাল রেল। এটি রেলের প্রথম 'গ্রিন ট্রেন করিডোর'। গত ২৪ জুলাই চেন্নাই-এ গ্রিন ট্রেন করিডোর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। রামেশ্বরম থেকে মানামাদুরাই পর্যন্ত ওই করিডোরের দৈর্ঘ্য ১১৪ কিলোমিটার। ওই রুটে ১০-টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মোট ২৮৬-টি কামরাতেই দূষণমুক্ত বায়ো টয়লেট বসানো হয়।

অন্যদিকে, দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের জন্য চালু হচ্ছে জীবন বিমা। ট্রেন-দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রীর মৃত্যু হলে তার পরিবার বিমা বাবদ পাবেন দশ লক্ষ টাকা। দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী স্থায়ীভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে, বিমা বাবদ তাকে দেওয়া হবে সর্বাধিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। আর গুরুতর জখম হয়ে কোনও যাত্রী হাসপাতালে ভর্তি হলে পাবেন সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা। মালপত্র (লাগেজ) হারিয়ে গেলে, ক্ষতিপূরণ সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা। বিমার 'প্রিমিয়াম' হিসেবে যাত্রীদের গুণতে হবে টিকিট-পিছু বাড়তি দু' টাকারও কম। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। আর একমাত্র অনলাইনে টিকিট 'বুক' করলেই এই সুযোগ আপাতত পাওয়া যাবে।

● **রূপান্তরকামীদের জন্য বিল পেশ লোকসভায় :**

গত ২ আগস্ট রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি দিতে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত করতে লোকসভায় পেশ করা হল 'ট্রান্সজেন্ডার পারসন্স (প্রোটেকশন অফ রাইটস) বিল, ২০১৬'। সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্মের ভিত্তিতে কারও প্রতি কোনও বৈষম্য করা যাবে না। সেই মতো রূপান্তরকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করতে এই উদ্যোগ।

এই বিলে রূপান্তরকামীদের যে অধিকার দিতে চাওয়া হয়েছে, তা হল, রূপান্তরকামীরা আবেদনের ভিত্তিতে জেলাশাসকের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র পাবেন। শিক্ষার যাবতীয় সুযোগ তারা পাবেন। কোনও রকম বৈষম্য করা যাবে না। শুধু তাই নয়, চাকরির, পদোন্নতির ক্ষেত্রে রূপান্তরকামীদের সঙ্গে কোনও রকম অবিচার বা বৈষম্য করা যাবে না। রূপান্তরকামীদের অভিযোগ মীমাংসার জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হবে। তাদের প্রতি বৈষম্য বা নির্যাতন করা হলে শাস্তি পেতে হবে।

● **রেলের 'স্বচ্ছ ভারত' সংক্রান্ত সমীক্ষা :**

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রভাব স্টেশনগুলিতে কেমন পড়েছে, তা দেখতে রেলমন্ত্রক গত ফেব্রুয়ারিতে এক সমীক্ষা চালায়। তাতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী এবং রেলের মোটবাহক ও ভেণ্ডারদের একটি অংশের মতামত নেওয়া হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী, স্টেশনগুলির স্থানও চিহ্নিত করেছে রেল। গাঢ় সবুজ : খুব ভাল; হলুদ : পরিচ্ছন্ন; কমলা : চলনসই; লাল : মন্দের ভাল এবং গাঢ় লাল : খুব খারাপ। যাত্রীদের মতের ভিত্তিতে তৈরি ক্রম অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতায় প্রথম দশ স্টেশন বিস, গাঁধীধাম, ভাস্কো-দা-গামা, জামনগর, কুম্বকোনম, সুরাত, নাসিক, রাজকোট, সালেম ও অঙ্কলেশ্বর। এর পাঁচটিই গুজরাতে। তাদের রং গাঢ় সবুজ।

পশ্চিমবঙ্গের (পূর্ব রেলে) পাঁচটি বড় স্টেশন—হাওড়া, শিয়ালদহ, শালিমার, নৈহাটি, ব্যান্ডেল, লাল রঙে চিহ্নিত। রাজ্যের আর এক বড় রেল স্টেশন বর্ধমান আরও পিছিয়ে। সে পেয়েছে 'খুব খারাপ' তকমা। হাওড়া, শিয়ালদহের সমগোত্রীয় স্টেশন মুম্বই সেন্ট্রালে যাত্রী সংখ্যা আরও বেশি। তবুও পরিচ্ছন্নতায় এ রাজ্যের দুই প্রধান স্টেশনের থেকে অনেকটা এগিয়ে। তালিকায় স্থান ১২৯। চেন্নাই ১২১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তিনটি স্টেশন বোকারো, রাউরকেল্লা ও টাটানগরের স্থান যথাক্রমে ৫০, ৫৪ ও ৭৯ নম্বরে। দিল্লি ও নিজামুদ্দিনের অবস্থাও তথৈবচ। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে দিল্লির স্থান ২৪৮ নম্বরে ও নিজামুদ্দিনের ৩৪৮ নম্বরে। পরিচ্ছন্নতার ক্রম অনুযায়ী সব থেকে নিচে থাকা ৫-টি স্টেশন মধুবনী, বালিয়া, বক্তিয়ারপুর, রায়চুর, সাহাগঞ্জ। সব ক'টিই বিহারে।

● **নতুন চেহারায় বারাণসী-হলদিয়া জলপথ :**

নতুন চেহারায় বারাণসী থেকে হলদিয়া জাতীয় জলপথ-১ চালু হবে ২০১৯ সালে। গত ১৬ আগস্ট জাতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান অমিতাভ বর্মা একথা জানান। গঙ্গার নাব্যতা বাড়াতে ফরাক্কা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত ড্রেজিং হবে। নতুন ন্যাভিগেশন লক বসানো হবে ফরাক্কায়। এই জলপথে বারাণসী, সাহেবগঞ্জ ও হলদিয়ায় তিনটি মাল্টি-মোডাল টার্মিনাল হবে। তৈরি হবে আরও তিনটি টার্মিনাল, অন্তত পাঁচটি রো-রো জেটি এবং ৪০-টি সাধারণ জেটিও।

● **গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণি :**

৭ আগস্ট থেকে গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজয় রূপাণি। ১৯৫৬ সালের ২ আগস্ট রেঙ্গুনে (বর্তমানে মায়ানমারের ইয়াঙ্গুন) জন্ম। ১৯৬০ সালে অবশ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে তার পরিবার ভারতে ফিরে আসে। বর্তমানে রাজকোট (পশ্চিম)-এর বিধায়ক রূপাণি, ২০০৬-'১২ সময়কালে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। উল্লেখ, বিজয় রূপাণি আনন্দীবেন প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত হলেন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরে রাজ্য সামলানোর দায়িত্ব আসে আনন্দীবেন প্যাটেলের হাতে। উল্লেখ্য, আনন্দীবেন প্যাটেল গুজরাটের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ

● **রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সূচনা :**

গত ১৪ আগস্ট এ রাজ্যে চালু হল প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারপিছু একজন মহিলাকে বিনা পয়সায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার প্রকল্প)। কলকাতায় প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান যে আগামী তিন বছরে রাজ্যের মোট ৮৫ শতাংশ পরিবারকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার; এবং তার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ ও বিপিএল (দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী) তালিকাভুক্ত পরিবারপিছু কিছুটা ভরতুকি বইতে ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে ২.১৫ কোটি পরিবারের মধ্যে ৫১ শতাংশের রান্নার গ্যাস সংযোগ রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এর ব্যবহার আরও কম। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে তাই বিপিএল পরিবারের পাশাপাশি সার্বিকভাবেই সংযোগ তিন বছরে ৮৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। নতুন সংযোগের প্রাথমিক খরচ হিসেবে ১,৬০০ টাকা বিপিএল পরিবারগুলিকে দিতে হবে না। তা দেবে কেন্দ্র। এর জন্য এ রাজ্যে খরচ হবে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

● **৩-টি সংস্থা বন্ধে সায় মন্ত্রিসভার :**

নিও পাইপস টিউব কোম্পানি লিমিটেড, ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি এবং লিলি প্রডাক্টস লিমিটেড—১৭ আগস্ট এই তিনটি সরকারি শিল্প সংস্থাকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবে শিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি, আর একটি রাজ্য সরকারি সংস্থা দুর্গাপুর কেমিক্যালসকে বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

● **ইকনমিক অফেন্স উইং-এর নতুন রূপ :**

রাজ্যের এক দশক পুরনো ইকনমিক অফেন্স উইং (ইওডব্লিউ)-কে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অর্থ দপ্তরের আওতা থেকে সরিয়ে ইওডব্লিউ-কে নিয়ে আসা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

অধীনে। এই দপ্তরের মন্ত্রী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট হবে ইওডব্লিউ। যাবতীয় নিজস্ব পরিকাঠামো থাকবে। রাজ্যের নতুন বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী কাজ করবে ইওডব্লিউ। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ-সহ আর্থিক বেনিয়মের তদন্ত থেকে শুরু করে বিচারপর্ব পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবস্থাই কার্যত এক ছাতার তলায় আসতে চলেছে।

নতুন ডাইরেক্টরেটকে একটা স্বাধীন চেহারা দিতে চায় প্রশাসন। ইওডব্লিউ-এর মাথায় থাকবেন আইজি পদমর্যাদার একজন আইপিএস অফিসার। এবার ডাইরেক্টরেটের অধীনে গোটা রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে। এর প্রতিটির দায়িত্বে থাকবেন একজন পুলিশ সুপার। তাদের অধীনে থাকবেন তিনজন করে ডিএসপি এবং একাধিক ইন্সপেক্টর। সব মিলিয়ে অন্তত ২৫০ জন পুলিশ অফিসার ও কর্মী ডাইরেক্টরেটের অধীনে কাজ করবেন। থাকবে সাইবার সেল-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ দল। নতুন আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা লড়ার জন্য ডাইরেক্টরেটের আওতায় একটি শক্তিশালী আইন সেলও থাকবে। সেই সেলে থাকবেন রাজ্য সরকার নিযুক্ত আইন অফিসারদের একটি দল।

● **'সবুজশ্রী', 'সমব্যথী' ও 'বৈতরণী' :**

সম্প্রতি জেলা সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তিনটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেন—'সবুজশ্রী', 'সমব্যথী' ও 'বৈতরণী'। নবজাতকের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় চারাগাছ দত্তক দেওয়ার প্রকল্প 'সবুজশ্রী'। সবুজায়ন (চারাগাছ লাগিয়ে), আয়ের নিশ্চয়তার (গাছ পরিণত হলে তাকে বিক্রি করে) পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়ানো। গাছ দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় প্রসূতিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পাঠানোর তাগিদ বাড়বে। কেননা, শিশু জন্মের তথ্য সরকারি নথিতে উঠলে তবেই দত্তক দেওয়া হবে চারাগাছ।

গরিব পরিবারের প্রয়াত ব্যক্তির পারানির কড়ি জোগানোর ব্যবস্থা হচ্ছে 'সমব্যথী' প্রকল্পে। হতদরিদ্র পরিবারের কেউ মারা গেলে তার সৎকারের জন্য এই প্রকল্পে সরকারি অনুদান মিলবে। এই প্রকল্পে মৃতদেহ সৎকারের জন্য দু' হাজার টাকা অনুদান দেবে সরকার। এই প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে। এর মধ্যে প্রথম বছরে খরচ ধরা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত তৃতীয় প্রকল্পটি হল 'বৈতরণী'। এই প্রকল্পে রাজ্যের সব শ্মশান পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা এবং সৎকারস্থল বাঁধিয়ে মাথায় ছাউনি বানিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রয়েছে প্রতিটি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর পরিকল্পনাও। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা হবে নলকূপ এবং শৌচাগারেরও।

● **৫-টি খাদ্য-পরীক্ষাগার হবে রাজ্যে :**

শিলিগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়্গপুর ও বহরমপুরে সরকারি খাদ্য-পরীক্ষাগার গড়ার পরিকল্পনা তৈরি করেছে রাজ্য। আর্থিক অনুদান দেবে কেন্দ্রীয় সরকারও। খাবারে ভেজাল বা ক্ষতিকারক পদার্থ আছে কি না, তা দেখতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই নতুন পাঁচটি পরীক্ষাগার গড়ে উঠবে। পরীক্ষাগারগুলি চালাবে কোনও বেসরকারি সংস্থা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে এখন সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ছ'টি পরীক্ষাগার রয়েছে। এর মধ্যে একটি কেন্দ্র খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নির্ণায়ক পর্ষদের অধীন। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে একটি পরীক্ষাগার রয়েছে। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্রিয়াজাত বা সাধারণ খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বাকি সব ক'টি বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি। এর বাইরে চারটি পরীক্ষাগার কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খাবারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে কি না, তা নিয়মিত পরীক্ষা করে ইতিবাচক শংসাপত্র পেলে এর নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হয়।

● **রাজ্যের নতুন পোর্টাল 'এগিয়ে বাংলা' :**

রাজ্যের নতুন পোর্টাল 'এগিয়ে বাংলা'-র উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে রাজ্য সরকারের পোর্টাল ছিল 'বাংলার মুখ'। তা প্রাথমিকভাবে তথ্যভিত্তিক ছিল। নতুন পোর্টাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র, সমস্ত বিভাগ ও আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য, নানা প্রকল্প, পর্যটন, শিল্প ও বিশ্ব বাংলায় নতুন উদ্যোগ-সহ নানা বিষয় জানা যাবে। এই পোর্টালে সরকারের নানা বিভাগের বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে বেশ কিছু পরিষেবার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন রাজ্যবাসী।

● **নিজস্ব আবহাওয়া কেন্দ্র খুলছে ডিভিসি :**

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাতীয় জল অনুসন্ধান প্রকল্পের আওতায় মাইথন (ন্যাশনাল হাইড্রোলিক প্রজেক্ট), পাঞ্চেত-সহ চারটি জলাধারে নিজস্ব আবহাওয়া কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাদের দাবি, এতে আগামী দিনে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা এখনকার তুলনায় সহজ হবে। সেচেরও উন্নতি হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের উন্নতির জন্য জাতীয় জল অনুসন্ধান প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দামোদর উপত্যকায় এই পরিকাঠামো গড়ার জন্য ডিভিসি-কে ৫০ কোটি টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক। চলতি বছরে কাজ শুরু হলেও এই প্রকল্প শেষ হবে ২০২০ সাল নাগাদ।

জলাধার নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিক তথ্য বা 'রিয়েল টাইম ডেটা' গুরুত্বপূর্ণ। ভরা বর্ষায় কখন কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, তা জানতে পারলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আবহাওয়া কেন্দ্র চালু হলে নদীতে জলের গতিবেগ ও গভীরতা মাপার ব্যবস্থা, কতক্ষণ ধরে কতটা বৃষ্টি হল এবং বৃষ্টির চরিত্র সম্পর্কে তথ্য থাকবে ডিভিসি-র হাতে। কোন নদীতে কত জল, জলাধার থেকে জল ছাড়লে কী পরিস্থিতি হতে পারে, সেই তথ্যও সহজে মিলবে। ফলে অন্তত তিন দিন আগে বন্যা পরিস্থিতি আঁচ করা যাবে। রাজ্যও ব্যবস্থা নিতে পারবে।

● **রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার কমল :**

সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' (এসআরএস) বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার ৩১ থেকে কমে প্রতি হাজারে ২৮ হয়েছে। এর আগে কেরালা, তামিলনাড়ু এবং দিল্লি এই লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছিল। এবার তা ছুঁয়ে ফেলল পশ্চিমবঙ্গও।

'রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া' স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' (এসআরএস) বুলেটিন প্রকাশ করে। এটি প্রতি বছর প্রকাশিত হয়। গোটা ভারতের জনসংখ্যার উপর এই সমীক্ষা হয়। নবজাতক-মৃত্যুর হারের কমা-বাড়া বোঝার জন্য এই রিপোর্টকেই মাপকাঠি ধরা হয়। নবজাতক-মৃত্যুর প্রকৃত হার বা 'ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট' বুঝতে এসআরএস রিপোর্টই গোটা দেশে প্রামাণ্য হিসেবে চিহ্নিত। সদ্যোজাতের অসুস্থতা রোখার যাবতীয় কর্মসূচি তৈরি হয় এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই। অবশ্য, এর আগেই স্বাস্থ্যমন্ত্রক প্রকাশিত ২০১৫-'১৬ সালের 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৪' (এনএফএইচএস-৪) রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়, গত দশ বছরে (২০০৫-'১৫) পশ্চিমবঙ্গে নবজাতক মৃত্যুর হার ২১ ভাগ (প্রতি হাজারে ৪৮ থেকে কমে প্রতি হাজারে ২৭) কমে গিয়েছে। নবজাতক-মৃত্যুর উপর লাগাম টানতে এ রাজ্যে তৈরি করা হয় সিক নিউ-বর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট (এসএনএসইউ)।

● **বাজি-নীতি তৈরির নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত :**

রাজ্যে বাজি কারখানাকে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে সবিস্তার নীতি-নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। এমনভাবে একটি নীতি-নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যাতে কারখানাগুলির উপরে অনলাইন নজরদারি চালানো যায়। সরকারি নথি বলছে, ১৫ কিলোগ্রামের বেশি মশলা ব্যবহার করে অথবা ওই ওজনের বাজি তৈরি করে, রাজ্যে এমন কারখানা আছে তিনটি। একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি এসপি ওয়াংদি ও বিশেষজ্ঞ সদস্য পি সি মিশ্রকে নিয়ে গড়া পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ এই বক্তব্য প্রকাশ করে।

● **রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নতুন নামকরণ :**

রাজ্য সরকার একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নতুন নাম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চালু কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির পরিবর্তিত নাম নিম্নরূপ :

■ ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	জল ধরো, জল ভরো
■ ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন	আনন্দধারা
■ খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প	খাদ্যসাথী
■ স্বচ্ছ ভারত অভিযান	নির্মল বাংলা
■ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা	রাজ্য গ্রাম সড়ক যোজনা

● **রাজ্যে আধার শিবিরের সংখ্যা বাড়ল :**

সরকারি আর্থিক সুবিধা পেতে আধান নম্বর আবশ্যিক। অথচ পরিসংখ্যান বলছে আধার কার্ডের বিষয়ে এ রাজ্য এখনও বেশ পিছিয়ে। তাই ১৯ আগস্ট থেকে শিবিরের সংখ্যা বাড়ানো হল পশ্চিমবঙ্গে। আধার কার্ডের জন্য জনগণনা দপ্তরের পাশাপাশি আলাদা করে ছবি তোলার ক্যাম্প বা শিবির চালু করল 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া' (ইউআইডিএআই)-ও। সংশ্লিষ্ট তথ্য ইউআইডিএআই-এর ওয়েবসাইটে (https://uidai.gov.in/ এবং https://resident.uidai.net.in/) উপলব্ধ। এর আগে ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত ইউআইডিএআই পশ্চিমবঙ্গে এ রকম শিবির করে ২০.৫ লক্ষ মানুষের ছবি তোলা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছিল। এরপর সেই দায়িত্ব পায় জনগণনা দপ্তর। তারা ৯১ শতাংশ মানুষের ছবি তুলে ও তথ্য নিয়ে আধার নম্বর তৈরির জন্য ইউডিএআই-এর কাছে পাঠায়।

রাজ্যভিত্তিক আধার শতকরা পরিসংখ্যান (১৫ আগস্ট পর্যন্ত)-এর তালিকা থেকে স্পষ্ট যে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এখনও পর্যন্ত এই নিরিখে যথেষ্ট পিছিয়ে।

রাজ্য	শতাংশ	রাজ্য	শতাংশ
♦ পাঞ্জাব	৯৯	♦ পশ্চিমবঙ্গ	৭৮
♦ কেরালা	৯৭	♦ বিহার	৬৬
♦ অন্ধ্রপ্রদেশ	৯৬	♦ জম্মু-কাশ্মীর	৬৩
♦ মহারাষ্ট্র	৯০	♦ মণিপুর	৬২
♦ মধ্যপ্রদেশ	৮৮	♦ অরুণাচলপ্রদেশ	৬২
♦ কর্ণাটক	৮৮	♦ নাগাল্যান্ড	৫২
♦ তামিলনাড়ু	৮৪	♦ মিজোরাম	৪২
♦ গুজরাট	৮৪	♦ মেঘালয়	৫
♦ উত্তরপ্রদেশ	৭৬	♦ অসম	৪

সূত্র: ইউআইডিএআই

অর্থনীতি

● **রঘুরাম রাজনের উত্তরসূরি ঊর্জিত প্যাটেল :**

রঘুরাম রাজনের পরে রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন গভর্নর হচ্ছেন বর্তমান ডেপুটি-গভর্নর ঊর্জিত প্যাটেল। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী তিন বছরের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের ২৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি। ৫২ বছরের ঊর্জিত প্যাটেলের ডেপুটি-গভর্নর হিসেবে এটি ছিল দ্বিতীয় দফা। প্যাটেল অষ্টম ডেপুটি-গভর্নর, যিনি রিজার্ভ ব্যাংকের শীর্ষ পদে উঠে এলেন। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত পরপর দু'দফায় তিনি শীর্ষ ব্যাংকের ডেপুটি-গভর্নর পদে আসীন।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ স্নাতক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমফিল, প্যাটেল পিএইচডি করেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ২০০৯ সাল থেকে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন-এ ফেলো। বেসরকারি (রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ), বহুজাতিক (বস্টন কনসাল্টিং), আধা সরকারি (আইডিএফসি) ও সরকারি (রিজার্ভ ব্যাংক)—সব রকম সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেই কাজের অভিজ্ঞতা আছে। কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) ও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকেও। পাশাপাশি, বিভিন্ন মন্ত্রকে উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন প্যাটেল।

● **ডাকঘর পেমেন্টস ব্যাংক :**

পেমেন্টস ব্যাংক গড়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র পেয়েছে ইন্ডিয়া পোস্ট বা ভারতীয় ডাকঘর। এই পোস্টাল পেমেন্টস ব্যাংক গড়ায় ডাকঘরের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রায় ৫০-টি প্রতিষ্ঠান

আগ্রহী। এগুলির মধ্যে আছে—বিশ্বব্যাংক, ডয়েশ ব্যাংক ও বার্কলেজ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮০০ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে পোস্টাল পেমেন্টস ব্যাংক গড়ে উঠবে। আপাতত ৬৫০-টি শাখা চালু হওয়ার কথা। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পোস্টাল পেমেন্টস ব্যাংকের পরিষেবা চালু হওয়ার কথা। এর আওতায় ১৩ লক্ষ ডাকপিওনের হাতে তুলে দেওয়া হবে ছোট একটি যন্ত্র, যার মাধ্যমে এটিএম ও অন্যান্য বাংকিং পরিষেবা মিলবে। মানি অর্ডারও পাঠানো যাবে।

- **কোম্পানি ঋণপত্র লেনদেন প্রসারের লক্ষ্যে সুপারিশ বিশেষজ্ঞ কমিটির :**

গত ১৮ আগস্ট ভারতে কোম্পানি ঋণপত্রের বাজার প্রসারের লক্ষ্যে গড়া বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করল সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। শেয়ার বাজারের ধাঁচে ভারতে কোম্পানি ঋণপত্রের বাজারকে ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ সুপারিশ জানাল বিশেষজ্ঞ কমিটি। রিজার্ভ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রক, সেবি এবং বিমা ও পেনশন তহবিল সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক আইআরডিএ এবং পিএফআরডিএ-র প্রতিনিধিরা ছিলেন এই কমিটিতে। ২০১৫ সালে গড়া কমিটির প্রধান আর বি আই-এর তৎকালীন অন্যতম ডেপুটি-গভর্নর এইচ আর খান। আর বি আই-এর গভর্নর থাকার সুবাদে আর্থিক স্থিতি ও উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রঘুরাম রাজন। তাই তার কাছে পেশ করা হয়েছে এই রিপোর্ট। এ ধরনের ঋণপত্র বা কর্পোরেট বন্ডের বাজারের পরিধি বাড়াতে বিভিন্ন সুপারিশ কার্যকর করার জন্য সময়সীমাও দিয়েছে কমিটি।

এই কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে : সেনসেক্স, নিফ্‌টির ধাঁচে সূচক তৈরি করা; বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘবের লক্ষ্যে কর্পোরেট বন্ডকে হাতিয়ার করা; এই বন্ড গচ্ছিত রেখে ব্যাংকগুলির আরবিআই ঋণ পাওয়ার নিয়ম চালু করা; বিদেশি লগ্নি সংস্থার এই বাজারে পা রাখার পথ মসৃণ করা ইত্যাদি।

- **এনপিএস-এ লগ্নির পথ আরও সহজ :**

অবসরের জন্য সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (এনপিএস)-এ লগ্নির পথ আরও সহজ করতে একাধিক ব্যবস্থা নিল পেনশন তহবিল সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক পিএফআরডিএ। এখন থেকে এনপিএস-এর টিয়ার-১ অ্যাকাউন্টের জন্য একটি আর্থিক বছরে ন্যূনতম জমার অঙ্ক কমিয়ে ১ হাজার টাকা করল তারা। এত দিন তা ছিল কমপক্ষে ৬ হাজার টাকা। অ্যাকাউন্টটি চালু রাখতে এই ১ হাজার টাকা জমা দিলেই চলবে। আর টিয়ার-২ অ্যাকাউন্টে আর্থিক বছরে কমপক্ষে ২৫০ টাকা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকল না; এবং ন্যূনতম ২ হাজার টাকা বছরে অ্যাকাউন্টে রাখার নিয়মও উঠল।

এ ছাড়া টিয়ার-১ বা ২ যে অ্যাকাউন্টই হোক না কেন, ন্যূনতম টাকা জমা না দেওয়ার কারণে যেগুলির লেনদেন পিএফআরডিএ বন্ধ করে দিয়েছিল, তার সবগুলিই চালু করে দেওয়া হবে। এখন থেকে ওই সব লগ্নিকারী তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া এনপিএস অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, এনপিএস-এ আওতায় টিয়ার-১ অ্যাকাউন্ট হল অবসরের তহবিল গড়ার লক্ষ্যে খোলা স্থায়ী অ্যাকাউন্ট। এখানে টাকা জমার পরে লগ্নিকারীর জানানো পছন্দ অনুসারে লগ্নি করা হয়। তবে টিয়ার-২ অ্যাকাউন্ট থেকে চাইলে টাকা তোলা যায়।

- **'অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা'-য় বিদেশি প্রত্যক্ষ লগ্নিতে মন্ত্রিসভার সায় :**

গত ১০ আগস্ট 'অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা'-য় (আদার ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসেস) সরাসরি বিদেশি প্রত্যক্ষ লগ্নিতে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ব্যাংক নয় এমন আর্থিক সংস্থায় (এনবিএফসি) বিদেশি লগ্নির পথ আরও প্রশস্ত করল কেন্দ্র। তবে শর্ত হল, তার জন্য সংস্থাগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংক ও সেবির মতো নিয়ন্ত্রকের আওতায় থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এনবিএফসি-র ১৮-টি ব্যবসায় ('মার্চেন্ট ব্যাংকিং, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, স্টক ব্রোকিং, ফাইন্যানশিয়াল কনসালট্যান্সি ইত্যাদি) ইতোমধ্যেই ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি আসতে পারে সরাসরি। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল 'অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা'-ও।

- **পাঁচ বছরের জন্য ৪ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা :**

আগামী পাঁচ বছরের জন্য মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করল কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদে সরকারি বিজ্ঞপ্তি পেশ করে অর্থ মন্ত্রক জানায়, রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে মূল্যবৃদ্ধির হারকে লাগাম পরিয়ে রাখা। তার সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ানোকেও দেওয়া হবে গুরুত্ব। তবে তা স্বল্প মেয়াদে, প্রয়োজন অনুযায়ী। কিন্তু লম্বা দৌড়ে আসল লক্ষ্য হবে মূল্যবৃদ্ধিতেই লাগাম পরিয়ে রাখা। এখন থেকে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত যার লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশ ঠিক করেছে কেন্দ্র। বেশি হলে তার ঊর্ধ্বসীমা হবে ৬ শতাংশ। কম হলে তা ২ শতাংশ হবে।

নতুন ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক বাজার দরকে ৪ শতাংশে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবে। ২ ও ৬ শতাংশের নিম্ন ও ঊধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হবে। টানা ন'মাস যদি বাজার দর এই সীমার বাইরে থাকে, তা হলে ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হবে। এই ব্যর্থতার কারণ, তার দাওয়াই এবং সেই দাওয়াই দিয়ে কত দিনের মধ্যে আবার মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ফিরবে, রিজার্ভ ব্যাংককে তা জানিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিতে হবে। উল্লেখ্য, আগামী দিনে ছয় সদস্যের ঋণ নীতি কমিটি সুদের হার ঠিক করবে। এই কমিটিতে গভর্নর, একজন ডেপুটি-গভর্নর ও অফিসারকে নিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের তিন প্রতিনিধি থাকবেন। বাকি তিনজনের নাম সরকার ঠিক করবে।

- **চার ব্যাংককে সঙ্গে মেশানোর অনুমোদন এসবিআই-এর পরিচালন পর্ষদের :**

১৮ আগস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় মহিলা ব্যাংক এবং তিনটি সহযোগী ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর (এসবিবিজে), স্টেট ব্যাংক অফ মহীশূর (এসবিএম) ও স্টেট ব্যাংক অফ ত্রিবাঙ্কুর (এসবিটি)-কে নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। যেসব ব্যাংককে

মিশিয়ে নেওয়া হবে, সেগুলির শেয়ার বিনিময়ের অনুপাত সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেদিন। মিশিয়ে নেওয়া চার ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংকের মধ্যে শেয়ার বিনিময়ের ব্যাপারে যা ঠিক হয়েছে, তা হল : এসবিবিজে-এর শেয়ারহোল্ডাররা তাদের হাতে থাকা প্রতি ১০-টি (মূল দাম ১০ টাকা) শেয়ারের বিনিময়ে স্টেট ব্যাংকের ২৮-টি (মূল দাম ১ টাকা) শেয়ার পাবেন। একইভাবে এসবিএম এবং এসবিটি শেয়ারহোল্ডাররা তাদের প্রতি ১০-টি শেয়ারের জন্য পাবেন স্টেট ব্যাংকের ২২-টি করে শেয়ার। ভারতীয় মহিলা ব্যাংক শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত নয়। তাদের ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৩১ হাজার ৫১০-টি শেয়ার কিনে নেবে এসবিআই। ব্যাংকগুলি মিশে গেলে দেশ-বিদেশ মিলে এসবিআই-এর শাখা সংখ্যা দাঁড়াবে ২২,৫০০। এটিএম ৫৮,০০০। বর্তমানে স্টেট ব্যাংকের মোট ১৬,৫০০ শাখা রয়েছে।

এর আগে আরও দু'টি সহযোগী ব্যাংক, ২০০৮ সালের স্টেট ব্যাংক অফ সৌরাষ্ট্র এবং ২০১০ সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্দোরকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। বাকি দু'টি সহযোগী ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ পাতিয়ালা এবং স্টেট ব্যাংক অফ হায়দরাবাদকেও নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেবে এসবিআই। তবে সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি। এগুলি বাজারে নথিভুক্ত নয়। তাদের ১০০ শতাংশ শেয়ারেরই মালিক এসবিআই।

● **বাজেট প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন :**

বাজেট তৈরির ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী কেন্দ্র। তার প্রথম ধাপ হিসেবে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেটকে মিশিয়ে দিতে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর প্রস্তাব মেনে নেয় অর্থমন্ত্রক। আর তারপর ফেব্রুয়ারির শেষ কাজের দিনের বদলে তার এক মাস আগেই সাধারণ বাজেট পেশের দিকে এগোল কেন্দ্র। সংবিধানে নির্দিষ্ট দিন বলা না-থাকলেও, সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির শেষ কাজের দিনে পেশ হয় পরবর্তী অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট। এবার তা জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বা ৩১ জানুয়ারি করার কথা। কারণ, পুরো বাজেট বিল পাশ হতে এপ্রিল-মে হয়ে যায়। ফলে অর্থবর্ষের ওই দু' মাসের খরচ চালাতে আলাদা করে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাস করতে হয়। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে ৩১ মার্চের আগেই পরবর্তী অর্থবর্ষের বাজেট বিল পাস করানো সম্ভব হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গে আলোচনা শুরুর সময়ও এখনকার নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে এগিয়ে সেপ্টেম্বরে নিয়ে আসতে চায় রাজস্ব দপ্তর।

● **রিজার্ভ ব্যাংকে সব দপ্তর ও মন্ত্রকের অ্যাকাউন্ড :**

নগদহীন লেনদেনে উৎসাহ জোগাতে সব মন্ত্রক ও দপ্তরকে অবিলম্বে রিজার্ভ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে বলল অর্থমন্ত্রক। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাদে ১০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রনিক ফোকাল পয়েন্ট ব্রাঞ্চ (ই-এফপিবি) অ্যাকাউন্ট কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার থেকে পাওয়া ডিভিডেন্ড, নানা প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা পাঠানো ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **হ্যাকারদের ঠেকাতে মহাকাশে প্রথম চিনা কোয়ান্টাম উপগ্রহ :**

গত ১৬ আগস্ট রাত দেড়টা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম চিনের গাংশু প্রদেশের জিউকিয়াং উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে পাঠানো হয় 'কোয়ান্টাম এক্সপেরিমেন্টস অ্যাট স্পেস স্কেল' বা 'কোয়েস' উপগ্রহ। এই প্রথম কোনও কোয়ান্টাম উপগ্রহ পাঠানো হল মহাকাশে। লক্ষ্য, মহাকাশ থেকে যাতে আমাদের এই বাসযোগ্য গ্রহের যে কোনও প্রান্তে অবাধে, অনায়াসে যোগাযোগ রেখে চলা যায় আর সেই 'পথে' যাতে আচমকা ঢুকে না পড়তে পারে হ্যাকার, স্প্যামার, ম্যালওয়্যার-লর্ডরা। এই উপগ্রহ মহাকাশে থাকবে টানা দু'টি বছর। এই দু'বছরে 'কোয়েস' মহাকাশ থেকে আলোর কণা ফোটন পাঠাবে রাজধানী বেজিং থেকে ৭৪৬ মাইল দূরে পশ্চিম চিনের জিনজিয়াঙের উরুমকি পর্যন্ত। এর আগে এই কোয়ান্টাম যোগাযোগের পরীক্ষাটা পৃথিবীতে করা সম্ভব হয়েছিল সর্বাধিক ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত।

● **হকিং-এর ৪২ বছর আগেকার তাত্ত্বিক উচ্চারণ প্রমাণিত :**

'ব্ল্যাক হোলস আর নট সো ব্ল্যাক', এই তাত্ত্বিক উচ্চারণটা স্টিফেন হকিং প্রথম করেছিলেন ১৯৭৪ সালে। আর ৪২ বছর পর তা প্রমাণিত হল পরীক্ষামূলক ভাবে। হকিং-এর ৪২ বছর আগেকার তাত্ত্বিক উচ্চারণকে হাতে-কলমে, গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করেছেন বলে দাবি, জেফ স্টেনহাওয়ার-এর। ১৯৭৪ সালে হকিং অঙ্ক কষে দেখান আলো-সহ ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই শুষে নেয় বলে যে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরকে আমরা নিকষ কালো বলে জানতাম, তা তত কালো নয়। কৃষ্ণগহ্বর থেকেও আলোর বিচ্ছুরণ, বিকিরণ হয়। তা যতই অল্প হোক। গত ১৫ আগস্ট 'হাইফার টেকনিওন-ইজরায়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'-র জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টেনহাওয়ার-এর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার-ফিজিক্স'-এ। স্টেনহাওয়ার গবেষণাগারে শব্দ তরঙ্গ (যার কণার নাম—'ফোনন') দিয়ে একটি ব্ল্যাক হোলের প্রতিরূপ বানিয়ে দেখান, সেখান থেকে কিছু কিছু বিকিরণ বেরিয়ে আসতে পারে। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন হকিং প্রায় চার দশক আগে।

হকিং তার তত্ত্বে বলেছিলেন, একটি ফোটন-জোড়া (দু'টো ফোটন কণা) 'ইভেন্ট হরাইজ্ন'-এ এসে পৌঁছলে একটি ফোটন ব্ল্যাক হোলের ভেতরে ঢুকে যায়। অন্য ফোটনটি 'ইভেন্ট হরাইজ্ন' থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। সেই জন্যই ব্ল্যাক হোল থেকে অল্প বিকিরণ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই 'হকিং রেডিয়েশন'-ই এক সময় সাড়ে সর্বনাশ ডেকে আনবে ব্ল্যাক হোলের। কারণ, অন্য কোনও ভাবে ব্ল্যাক হোল তার ভর বাড়াতে না পারলে এই বিকিরণের ফলেই ব্ল্যাক হোল ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাবে। তার পর এক দিন হয়ে যাবে বেমালুম উধাও।

প্রয়াণ

● **মহাশ্বেতা দেবী :**

দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন সমাজকর্মী-লেখক মহাশ্বেতা দেবী। বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ২৯ জুলাই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার অন্ত্যেষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান-সহ শাসক ও বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদদের পাশাপাশি প্রচুর সাধারণ মানুষও শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন।

১৯২৬ সালে জন্ম। মহাশ্বেতা দেবী সাহত্যিচর্চার পাশাপাশি অধ্যাপনা এবং সামাজিক আন্দোলনও চালিয়ে গিয়েছেন সমান তালে। অনগ্রসর শ্রেণির জন্য তার লড়াই চিরস্মরণীয়। আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে লোধা ও শবরদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর কাজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছে। 'অরণ্যের অধিকার', 'অগ্নিগর্ভ', 'তিতুমির', 'হাজার চুরাশির মা'-সহ তার বহু সৃষ্টি চিরন্তন হয়ে রয়েছে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে। তার একাধিক রচনা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন পুরস্কার জয়ী ছবি। শুধু বাংলায় নয়, গোটা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সমসাময়িক কালে সবচেয়ে সম্মানিত নামগুলির অন্যতম মহাশ্বেতা দেবী। জ্ঞানপীঠ, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ সম্মানিত হন। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। পান ম্যাগসেসে পুরস্কারও।

● **সৈয়দ হায়দার রাজা :**

দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৯৪ বছর বয়সে দিল্লির এক হাসপাতালে গত ২৩ জুলাই মারা গেলেন চিত্রশিল্পী সৈয়দ হায়দার রাজা। জন্ম ১৯২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, মধ্যপ্রদেশে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৈরি হয় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পুরোধা 'বোম্বে প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ'। রাজা-সহ সেই দলেই ছিলেন মকবুল ফিদা হুসেন, তায়েব মেটা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা। রাজার ক্যানভাসেই 'বিন্দু', 'প্রকৃতি-পুরুষ', 'কুণ্ডলিনী' ইত্যাদি সিরিজে ফুটে ওঠে গতিময় বিমূর্ত চিত্রকলা। তার আধুনিক তন্ত্রদর্শন। ভারতীয় ছবির উত্থানে তিনি দিক নির্দেশক। কখনও তার ছবি বিক্রি হয়েছে ১৮ কোটিতে, কখনও বা প্রায় ১৯ কোটি টাকায়। ছবির বাজারে যা রেকর্ড। ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী (১৯৮১), পদ্মভূষণ (২০০৭) ও পদ্মবিভূষণ (২০১৩)-এ সম্মানিত করে। পাশাপাশি ফ্রান্সও তাকে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান Commandeur de la Legion d'honneur বা সংক্ষেপে 'লেজিয়ঁ দ্য অনর' দেয় (জীবনের ছ'দশক ফ্রান্সে কাটান তিনি)।

● **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় :**

দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ১৯ আগস্ট কলকাতার এক হাসপাতালে মারা যান বাংলার অন্যতম সেরা আম্পায়ার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (৭১)। মাত্র ২২ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলিয়ে অনন্য নজির গড়েন। ভারতে এই বয়সে প্রথম শ্রেণির ম্যাচে আম্পায়ারিং আজ পর্যন্ত আর কেউ করেননি। ১৯৮৩ থেকে ১৩-টি আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ম্যাচ খেলান। ৬৪-টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে আম্পায়ার ছিলেন। আম্পায়ারিং থেকে অবসরের পর বোর্ডের ম্যাচ রেফারি, বোর্ড আম্পায়ারদের কোচের ভূমিকাতেও দেখা যায় তাকে।

খেলা

রিও-র ডায়েরি ২০১৬

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক-এর ৩১তম আসর ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে ৫ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। রিও-

এর ৩৩-টি ভেন্যু এবং ব্রাজিলে সর্ব বৃহৎ শহর সাও পাওলো, রাজধানী ব্রাসিলিয়া এবং মানাউশ ও সালভাদোর শহর থেকে আরও ৫-টি ভেন্যু নির্বাচন করা হয়। ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ১২১তম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)-র মিটিংয়ে রিও ডি জেনিরোকে আয়োজক শহর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

● **পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু :**

(জন্ম ৫ জুলাই ১৯৯৫) রিও অলিম্পিকে মেয়েদের ব্যাডমিন্টন একক ইভেন্টের সেমিফাইনালে (১৮ আগস্ট) জাপানের নোজমি

ওকুহারাকে পরাজিত করেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে অলিম্পিকে মেয়েদের ব্যাডমিন্টন একক ইভেন্টে ফাইনালে পৌঁছান। ফাইনালে (১৯ আগস্ট) বিশ্বের প্রথম স্থানাধিকারী ক্যারোলিনা মেরিনের বিরুদ্ধে ২১-১৯-এ প্রথম সেট জেতেন। তবে দ্বিতীয় সেট ১২-২১-এ পরাজিত হন। তৃতীয় সেটে ১৫-২১-এ পরাজিত হয়ে রুপোর পদক লাভ করেন। অলিম্পিকে রুপোর পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা পি ভি সিন্ধু। ভারতের সব থেকে কম বয়সী অলিম্পিক পদকজয়ীও বটে। উল্লেখ্য, তিনি ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২-তে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন র‍্যাংকিং-এ ব্যাডমিন্টনে শীর্ষ কুড়িজন খেলোয়াড়ের তালিকায় স্থান করে নেন। ১০ আগস্ট ২০১৩ সালে, সিন্ধু প্রথম ভারতীয় মহিলা একক খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতেন। ৩০ মার্চ ২০১৫ সালে, তিনি ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান, পদ্মশ্রী পান।

● **সাক্ষী মালিক :**

(জন্ম ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২) ২০১৬-র গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে মহিলাদের ৫৮ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

ব্রোঞ্চ পদক জয় করেন। প্রথম ভারতীয় নারী হিসেবে অলিম্পিকে কুস্তিতে পদক জয়। মালিক এর আগে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪-র কমনওয়েলথ গেমসে রুপো এবং দোহায় ২০১৫-র এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। এছাড়াও ২০১৪-র ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬০ কেজি বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

● **দীপা কর্মকার :**

(জন্ম ৯ আগস্ট ১৯৯৩) রিও অলিম্পিকে মহিলাদের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। তবে এখানেই তার সাফল্যের কাহিনীর শেষ নয়। পদক না জিতলেও তার অলিম্পিকের এই আসরে কৃতিত্ব, শুধু ভারতীয় জিমন্যাস্টিকস-এই নয়, বিশ্বেও নজিরবিহীন। তিনি জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন 'প্রদুনোভা ভল্ট' সম্পন্নকারী পাঁচ নারীর মধ্যে একজন, এবং তাতে তার স্কোর ছিল সর্বোচ্চ (১৫,১০০)। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ৫২,৬৯৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম ভারতীয় মেয়ে জিমন্যাস্ট হিসাবে অলিম্পিক গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন। ৫২ বছর পরে ভারতের কোনও জিমন্যাস্ট এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করল। এর আগে দীপা কর্মকার গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪-র কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় আর্টিস্টিক বা শৈল্পিক জিমন্যাস্ট হিসাবে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। এর

পূর্বে জিমন্যাস্টিকস-এ কোনও ভারতীয় আন্তর্জাতিক কোনও সম্মান পায়নি। এছাড়া এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন এবং ২০১৫-র ওয়ার্ল্ড আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম স্থান অর্জন করেন, দেশের মধ্যে প্রথম।

● **নীতা আম্বানি :**

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য হলেন নীতা আম্বানি। ভারতের প্রথম মহিলা আইওসি সদস্য তিনি। ৪ আগস্ট রিওতে আইওসি-র বার্ষিক সভায় নতুন ৮ জন সদস্যকে নেওয়া হয়। নীতা তাদের মধ্যে একজন। ৫২ বছরের নীতা ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত ওই পদে থাকতে পারবেন। এর আগে রণধীন সিং টানা ১৪ বছর আইওসি-র সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত, কর্পোরেট জগতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য হওয়ার আগে থেকেই ক্রীড়া জগতেও নীতা আম্বানি অচেনা মুখ নয়, বিশেষত ভারতীয় ক্রিকেট (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ-এর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেট দলের মালিকানার শরিক) ও ফুটবল (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা 'ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেড' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান) দুনিয়ায়।

● **লোলিতা বব্বর :**

ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র লোলিতা বব্বর নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন। তিনি হাজার মিটার স্টিপ্‌লচেস-এ মাত্র ৯ মিনিট ১৯.৭৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্ট-এর হিটস্-এ ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছান। এর আগে, ১৯৮২ সালে পি. টি. উষা এই নজির গড়েন।

এক নজরে রিও অলিম্পিক

- এই প্রথমবার দক্ষিণ আমেরিকায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল। বসবাসযোগ্য মহাদেশগুলির মধ্যে শুধু আফ্রিকাতেই অলিম্পিক হয়নি।
- অলিম্পিক-এ প্রত্যাবর্তন হল ২-টি খেলার—৯২ বছর পর ফিরল রাগবি ও গল্‌ফ ফিরল ১১২ বছর পর।
- কসোভো ও দক্ষিণ সুদান প্রথমবার যোগ দিল অলিম্পিক-এ।

- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট ২০৬-টি দেশ।
- পাশাপাশি ৩-টি খেলায় অংশ নেন 'রিফিউজি' অলিম্পিক দলের ১০ সদস্য। জাতীয় পতাকার পরিবর্তে এই শরণার্থীদের দলটি অলিম্পিক পতাকা ব্যবহার করে। এদের 'দেশের কোড' বা 'কান্ট্রি কোড' ROT (Refugee Olympic Team)।
- কুয়েতের এক দল খেলোয়াড় 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট অলিম্পিক অ্যাথলিট্স'-এর তকমা ও অলিম্পিক পতাকা নিয়ে এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কারণ, তাদের দেশের জাতীয় অলিম্পিক কমিটিকে সাসপেন্ড করা হয়।
- ২৮-টি খেলার ৪১-টি বিভাগের ৩০৬-টি ইভেন্ট মিলিয়ে মোট মেডেল সংখ্যা ৯৭৪।
- মোট ১১,৩০৩ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন।
- বিক্রি হয় আনুমানিক ৭৫ লক্ষ টিকিট।
- ব্রাজিলিয়ান মুদ্রায় রিও অলিম্পিকের আনুমানিক বাজেট প্রায় ৩৭ হাজার কোটি রিয়াস।
- রিও অলিম্পিক-এর আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ৬৫ জন পুরুষ ও ৫৪ জন মহিলা খেলোয়াড়।
- পদক জয়ী মাত্র দু'জন—ব্যাডমিন্টনে পি ভি সিন্ধু (রুপো) ও কুস্তিতে সাক্ষী মালিক (ব্রোঞ্জ)।
- জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার-সহ শুটার অভিনব বিন্দ্রা এবং টেনিস মিক্সড ডাবল্স-এ সানিয়া মির্জা ও রোহান বোপান্নার জুটি চতুর্থ স্থানে পৌঁছান।
- একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতের স্থান পদক তালিকায় ৬৭-তম।

অলিম্পিক-এর পদক তালিকায় সেরা দশ

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৬	৩৭	৩৮	১২১
২	গ্রেট ব্রিটেন	২৭	২৩	১৭	৬৭
৩	চিন	২৬	১৮	২৬	৭০
৪	রাশিয়া	১৯	১৮	১৯	৫৬
৫	জার্মানি	১৭	১০	১৫	৪২
৬	জাপান	১২	৮	২১	৪১
৭	ফ্রান্স	১০	১৮	১৪	৪২
৮	দক্ষিণ কোরিয়া	৯	৩	৯	২১
৯	ইটালি	৮	১২	৮	২৮
১০	অস্ট্রেলিয়া	৮	১১	১০	২৯

বিবিধ

● **দুই ভারতীয় পেলেন র‍্যমন ম্যাগসেসে পুরস্কার :**

২০১৬ সালের র‍্যমন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড উঠল দুই ভারতীয়ের হাতে। মানবাধিকার কর্মী বেজওয়াদা উইলসন এবং দক্ষিণ ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ টি এম কৃষ্ণ এই পুরস্কারে সম্মানিত হন। ফিলিপাইনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট র‍্যমন ম্যাগসেসে-র নামে প্রতি বছরই সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে তাদের কাজের জন্য সম্মান জানানো হয়। এ বছর মানুষের প্রাথমিক অধিকার নিয়ে নানান কাজ করার জন্য বেজওয়াদা উইলসন এই পুরস্কারে সম্মানিত হন। পাশাপাশি সংস্কৃতির উপর সমাজের প্রভাব নিয়ে কাজ করে সম্মানিত হন টি এম কৃষ্ণ।

● **বিশ্বের বৃহত্তম বিমান :**

মধ্য ইংল্যান্ডের কার্ডিংটন বিমানঘাঁটি থেকে ১৭ আগস্ট আকাশে পরীক্ষামূলক ভাবে উড়ল বিশ্বের বৃহত্তম বিমান। লম্বায় ৯২ মিটার (প্রায় ৩০২ ফুট)। এই 'এয়ারশিপ' বা উড়োজাহাজের চেহারাটা অবিকল একটা জাহাজের মতো। নাম 'এয়ারল্যান্ডার-১০'। অত বড়ো আর অত ভারি। তাই তা আকাশে বেশি ওপরে উঠতে পারবে না। আকাশে ওড়ার উচ্চতা হতে পারে বড়োজোর ৬ হাজার ১০০ মিটার। আর সর্বাধিক গতি হতে পারে ঘণ্টায় ১৪৮ কিলোমিটার। নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, হেলিকপ্টার বানানোর প্রযুক্তির চেয়ে সস্তা ও পরিবেশ বান্ধব প্রকৌশলেই এই 'এয়ারশিপ'টি বানানো হয়েছে। গোটা 'আকাশ-জাহাজ'টি ভরা রয়েছে হিলিয়ামে। কোনও যাত্রী ছাড়াই যা আকাশে উড়তে পারে একনাগাড়ে সপ্তাহ দু'য়েক। আর যাত্রী থাকলে এই 'এয়ারল্যান্ডার-১০' আকাশে উড়তে পারে টানা পাঁচ দিন।

এই কার্ডিংটন বিমানঘাঁটি থেকেই ১৯৩০ সালের অক্টোবরে এমন একটা জাহাজ আকাশে ওড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ৮৫ বছর আগে সেই 'এয়ারশিপ-আর ১০১' আকাশে ওড়ার পর ৮৪ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়েছিল ফ্রান্সে। এ বার এই 'এয়ারল্যান্ডার-১০' বানানো হয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য আকাশ থেকে নজরদারির লক্ষ্যে। নির্মাতা 'হাইব্রিড এয়ার ভেহিকেলস' (এইচএভি)-এর তরফে জানানো হয়েছে, রণক্ষেত্রে মালবহনের জন্যেও ওই বিমান ব্যবহার করা যাবে। এমনকী, অসামরিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভাবেও মালবহনের জন্য ব্যবহার করা যাবে এই 'আকাশ-জাহাজ'-টিকে। [উল্লেখ্য, ২৪ আগস্ট দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক অভিযানের সময় বিমানটি ক্র্যাশ করে।]❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপতি ভবনের ওপর প্রকাশিত কয়েকটি বই

২০১৬ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম হামিদ আনসারি "Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan" শীর্ষক বইটি প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির হাতে প্রথম কপিটি তুলে দেন।

গত দু'বছরে প্রকাশন বিভাগ রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন দিক, যেমন—এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঐতিহ্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে একটি বইয়ের সিরিজ প্রকাশ করে। সম্প্রতি উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এর পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিটি বইয়ের প্রথম কপি তুলে দেওয়া হয়। যে বইগুলি এদিন প্রকাশিত হয়, সেগুলি হল : The First Garden of the Republic : Nature of the President's Estate, Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan, Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan, A Work of Beauty : The Architecture & Landscape of the Rashtrapati Bhavan এবং Around India's First Table : Dining & Entertainment at the Rashtrapati Bhavan।

অনুষ্ঠানে বইগুলির প্রশংসা করা হয়। বিশেষত, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে বলেন, "এই বইগুলি...হল 'গ্রন্থ', যা ইতিহাসে ছাপ রেখে যাবে।"

এর আগে প্রকাশন বিভাগ রাষ্ট্রপতি ভবন সিরিজের চারটি বই প্রকাশ করেছে, —Winged Wonders, Indradhanush, Right of the Line : The President's Bodyguard, Abode under the Dome, The Presidential Retreats এবং Selected Speeches of Pranab Mukherjee-র তিনটি খণ্ড।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

September, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Books on Rashtrapati Bhavan Released Recently

(i) Work of Beauty : The Architecture and Landscape of the Rashtrapati Bhavan

This exhaustive volume documents the entire landscape around and architecture of the Rashtrapati Bhavan estate, starting from its construction as Government House, after the capital of British India shifted from Calcutta to Delhi in 1911.

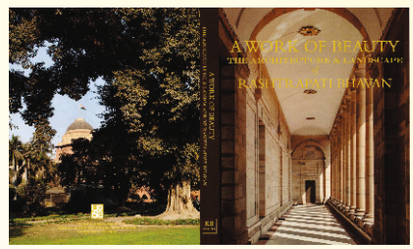

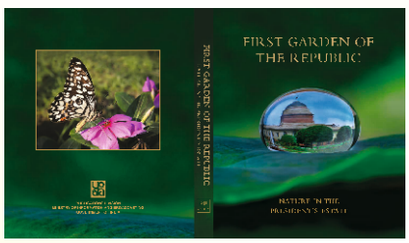

(ii) First Garden of the Republic : Nature in The President's Estate.

First Garden of the Republic documents the flora and fauna of the Estate across the season. It shows how human agency creates and curette this habitat and explores how plants and animals make the President's Estate their own, adapting it to their ends, and the challenges these living creatures and their habitats face today.

(iii) Around India's First Table : Dining and Entertaining at the Rashtrapati Bhavan

This volume traces the history of dining and entertaining at Rashtrapati Bhavan from the days when the British viceroys served French food in the stately dining room, through the early years of the republic, and the gradual replacement from Western to Indian cuisine. The reader is take behind the scenes to follow the careful preparations which make India's first table a site for successful gastronomic diplomacy.

(iv) Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan

This volume extensively documents and catalogues the various artworks on display in the lush interiors of the vast Rashtrapati Bhavan estate. It includes vivid descriptions about the history and stylistic features of the furniture, paintings. It also covers interesting information about textiles, murals, and carpets that adorn the estate, illustrated with pictures of artworks, reproduction of plans and rare archival documents, the reader gets an entry into the magnificent world and is made familiar with the general interior design of the Rashtrapati Bhavan.

(v) Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan

This short volume aims to acquaint children with the fascinating story of the Rashtrapati Bhavan–how it was built, the events it has witnessed and the role that it plays in the life of the nation and the people who live and work there, through interesting stories, fascinating facts and descriptive chapters.

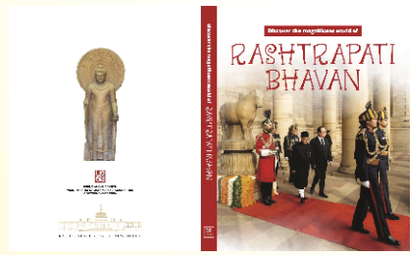

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।